অন্য স্বাদ
মনন দাস

অন্য স্বাদ

ANYA SWAD

A Collection of short stories

by

MANAN DAS

প্রথম প্রকাশ : ই-বই
লিটিল ম্যাগাজিন বই মেলা ২০১৮

প্রকাশক : মহামায়া দাস
গ্রন্থস্বত্ব : সৌরভ পাঁজা
দ্যুতি মণ্ডল।

প্রচ্ছদ : প্রদীপ মণ্ডল।

অন্য স্বাদ

মনন দাস

কৃশানু
৩০/১ এ, কলেজ রো ,
কোলকাতা ৭০০০০৯

উপহার :

সুদীপ বসু

স্নেহাস্পদেষু

সূচীপত্র :

অভিযোগ

গায়ের ওপর মাথার ওপর টুপটাপ খসে পড়ছে পাকা কুল, কুলগাছের তলায় শুয়ে আছে সে — নাকি বসে আছে ? কুল কুড়িয়ে জড়ো করতে ইচ্ছে অথচ হাত উঠছে না এমনই অবশ শরীর...জুট মিলের পাঁচিলের পাশ দিয়ে ওই ছুটে আসছে পাঁচু আর লক্ষ্মী...মা আমাকে আরেকটু কুলের আচার দাও, ভাতগুলো খেতে পারছিনা...আচার কোথায় রে, এইতো কুল কুড়োচ্ছি সবে আঁচল পেতে...

কুল কুড়োনোর স্বপ্ন দেখছিল সরলা, এমন সময়—মাগো—ও মাগো—কার যেন কান্নার শব্দ ঘুমের মধ্যে অনুপ্রবেশ করলে আস্তে আস্তে ঘুম ভেঙে গেল তার। মুখের ওপর টুপ করে ঝরে পড়ল জলের ফোঁটা, মশারির চাল ভেদ করে আসায় জলের ফোঁটাটা ছিটিয়ে গেছে। আবারও এক ফোঁটা গলার কাছে—টালির চাল দিয়ে জল চুইয়ে পড়ছে।

কে কাঁদছে ? বুঝতে চেষ্টা করল সরলা,—উঠোনের ওপারের ঘর থেকে বাঁশির গলার আওয়াজ না ? কি বলছে ও ? ঘরে জল ঢুকছে বলছে না ? ধড়মড় করে উঠে বসল সরলা, তাড়াতাড়ি মশারি তুলে তক্তাপোষ থেকে নামল এবং পায়ের পাতা তার জলে ডুবে গেল। ভয়ে সিটিয়ে গেল সরলা, অন্ধকার গিলে আছে ঘর। মা গঙ্গা কি কুল ছাপিয়েছে ? ডুবিয়ে দেবে ঘর সংসার ?

—ওরে ওঠনারে—ও পাঁচু ও লক্ষ্মী—চিৎকার করে উঠল সরলা।

গত তিন চারদিনের একটানা বৃষ্টির সঙ্গে আজকের বৃষ্টির কোন তুলনাই হয় না। সে বৃষ্টি ছিল ঝিরঝিরে বৃষ্টি, যদিও মাঝে মাঝে জোর হচ্ছিল কিন্তু সে এমন আকাশভাঙা নয়। কিন্তু আজ বিকাল থেকে এতো মেঘ আকাশে ঠেলে দিল ! তখন সরলা কেরোসিনের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে। বাপরে বাপ, একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল ! এদিকে লাইনেও বেড়েছে হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি। ধাক্কাধাক্কিতে সামনে পিছনে টলতে টলতে আকাশের দিকে তাকিয়ে সরলার মনে হচ্ছিল এতখানি আকাশেও বুঝি মেঘেদের কুলোচ্ছে না, ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করছে।

তারপর নামল আকাশভাঙা বৃষ্টি। জলের কি তোড় ! এখন এই মাঝ রাত্তিরেও সেই তোড় সমানে চলছে।

বৃষ্টি ও ব্রজ্রপাতের শব্দ মাথায় নিয়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত জেগেছিল সরলা। রাত দশটা থেকে শোয়া ইস্তক সেই যে ঘুম আসেনি জুট মিলের পেটা ঘড়িতে শেষ ঘণ্টা শুনেছিল দুটো, তারপর কেমন তন্দ্রামতো—নাকি ঘুমিয়েই পড়েছিল সে ? বুকের মধ্যে যে ব্যথাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল সন্ধ্যা থেকে সেই ব্যথাই সরলাকে ঘুমোতে দেয়নি। দুঃখের ধান্ধায় চরকির মতো ঘুরতে ঘুরতে জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে—তার ওপর এমন কথা। বৃষ্টিতে উনুইঝুঁটি ভিজে কেরোসিন নিয়ে এসে পায়ের গোছের কাছে কাপড়টা একটু

নিংড়ে সবে ঘরে ঢুকেছে সরলা—ভিজে কাপড়টাও ছাড়েনি—গণেশ তক্তাপোষে উবু হয়ে বসে বিড়ি টানছিল তখন, বিড়িতে লম্বা একটা টান দিয়ে বলল—অত কিসের হাসির কথা হচ্ছিল গিরিধারীর সঙ্গে ?

কথাটা চাপা গলায় এমন হিস্‌হিসিয়ে বলল গণেশ ! পাঁচু তখন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে আর লক্ষ্মী উনুন জেলে ভাত রাধছে। দুজনেই দোরে তাই, নইলে সাত বছরের ছেলে আর দশ বছরের মেয়ের কানে এমন কথা ঢুকলে—

মাথার মধ্যে যেন ছেনি বসিয়ে হাম্বর মারল গণেশ, রক্ত ছিটকে উঠল বুঝি, মনে হলো বলে—পিরীত হচ্ছিল। কিন্তু ঠোঁটের আগায় কথাটা এসে গেলেও ঠেলে ভেতরে নামিয়ে দিল সরলা, শুধু জলন্ত চোখে স্থির খানিকক্ষণ তাকিয়ে দড়ির আলনা থেকে শুকনো কাপড়টা নিয়ে দোরে বেরিয়ে এল সে এবং কাপড় ছাড়তে ছাড়তে যেন কিছুই হয়নি এমন স্বাভাবিক গলায় মেয়েকে বলল—লক্ষ্মী, আমাদের কেরাসিনের টিনটায় ওটা থেকে এক লিটার ঢেলে নে, কত অব্দি ঢালবি জানিস তো ? টিনের গায়ে দাগ দেওয়া আছে।

সাধনবাবুদের বাড়ী গিয়েছিল সরলা কিছু পয়সার তাগাদায়। দুর্দিনের সম্বল সে এসব বাড়ীতেই জমিয়ে রাখে। শুক্‌রুখো কালে জোর করে সে বেশী বেশী ঘুঁটে এসব বাড়ীতে ঢেলে দিয়ে আসে, বলে,—মা, এখন পয়সা দিতে হবেনে গো, তুমি যেখেনে হোক গুছিয়ে তুলে রাখো, যখন বর্ষা পড়বে তখন আমার কথা মনে পড়বে, বলবে—হ্যাঁ, সরলা গছিয়ে দিয়েছিল বলে এমন বর্ষায় আঁচ ধরিয়ে বাঁচলেম।

এই বেশী বেশী ঘুঁটে ঢেলে দেওয়া আর তার হিসাব রাখা সেটা ছিল সরলার এক দায়। সব সময়ই বাবুদের হিসাবই মেনে নিতে হতো। সব বাড়ী যে পয়সা হুড়িয়ে নেয় তা নয় কিন্তু কোন কোন বাড়ী কারচুপি করত বইকি। এখন সে একটা কাগজে পাঁচুকে দিয়ে লিখিয়ে রাখে। আঁকা বাঁকা হাতের লেখায় পাঁচু নাম লেখে—পাশে দাম। কাগজটা সে যত্ন করে বিছানার তলায় রেখে দেয়। রাখতে গিয়ে হিজিবিজি আঁকিবুকিগুলোর দিকে অবাক হয়ে মাঝে মাঝে চেয়ে থাকে। এর মধ্যে কতো ! জারিজুরি চলবেনে ! এইতো সেদিন লাল বাড়ীর গিন্নী হিসেব দিচ্ছিল ন'টাকা, সে ঘরে এসে পাঁচুকে দিয়ে পড়ালো—তিন টাকা, পাঁচ টাকা আবার তিন টাকা তাহলে মোট এগারো টাকা। পাঁচুকে নিয়ে তার অনেক আশা,—পাঁচু আমার ভালো করে লেখাপড়া শিখবে, বড়ো হবে, চাকরি করে টাকা আনবে—ওই সাধনবাবুর ছেলের মতো। তখন কি আর বলাই মিস্ত্রি লেনের এই বস্তির একটা ঘরে ভাড়া থাকবে সরলা ? না ঘুঁটে দেবে জুট মিলের দেওয়ালে ?

তা সাধনবাবুর বাড়ীর লোকজন কিন্তু সত্যিই ভাল। কখনো সখনো গিন্নিমা আটআনা একটাকা এমনিই দেয়। অবশ্য সরলাও সেজন্য এটা ওটা করে দেয়। এইতো আজ টাকা চাইতে গেলে গিন্নিমা বলল—সরলা, কেরোসিন একেবারে নেই। একটু বেশী দাম

দিয়েই যাহোক একটু জোগাড় করে দে। সেবার কোথা থেকে তিন টাকা লিটার এনে দিয়েছিলি।

তেলের জায়গা আর পনেরোটা টাকা দিয়েছিল গিন্নিমা, অনেক কষ্টে পাঁচ লিটার তেল নেয্য দামেই পেয়েছে সে, আর তা থেকে এক লিটার ঢেলে নিল। চার লিটার পেলেই গিন্নিমা খুশী। তাহলে হলো বারো টাকা। কিন্তু পাঁচ লিটারে লেগেছে সাড়ে বারো টাকা—আড়াই টাকা ফেরৎ দিলেই হবে—বললে হবে পঞ্চাশ পয়সা নিলুম গো মা।

তেলটা পৌঁছে দিয়ে আসা উচিত—কিন্তু এমন বৃষ্টি !

অথচ এই সংসারের সুসারের জন্য এত কাণ্ড করে তারপর তুমুল বৃষ্টি মাথায় করে ঘরে ফিরে শুনতে হলো কিনা—উঃ ! অসহ্য !

কাপড় ছেড়ে সেই যে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে গুম হয়ে বসেছিল সরলা উঠল একেবারে খাওয়ার সময়।

রান্নার মধ্যে তো ফ্যানে ভাত। একটা আলুও তার মধ্যে নেই। অতএব রান্না পলকেই শেষ। কিন্তু পাঁচু পড়ছিল তাই আটটা পর্যন্ত বসে থাকা, তারপর খাওয়া। নুন মাখা ফ্যানে ভাত একটোসা কুলের আচার দিয়ে খাওয়া। খাবার গলা দিয়ে যেন নামছিল না তার। না, শুধু ফ্যানে ভাত বলে নয়—এ গেলা তো রোজই এমন, কিন্তু গলার কাছে কি যেন এক কষ্ট ঠেলে উঠছিল তার—ভাতের গরাস নামতে দিচ্ছিল না। তবু কষ্ট করেই গিলল সরলা, এতগুলো ভাত ফেলা যাবে।

তারপর বাসন মাজা। দোরের সামনেই টালির চাল থেকে অনবরত জল ঝরছে ছাঁচায়, উনুন থেকে একটু ছাই নিয়ে দোরে বসে বসেই বাসন মেজে বৃষ্টির জলে ধুয়েছিল সে তারপর দরজা বন্ধ করে লম্ফ নিভিয়ে মশারির ভিতর তক্তাপোষে ঢুকে পড়েছিল। চারজন তক্তাপোষে ধরে না, মেঝেতেই শোয় সে, কিন্তু এই বর্ষায় মেঝে এতো স্যাঁতসেতে ! তার ওপর পোকামাকড় আর মশার উপদ্রব, তাই কোন রকমে পা গুটিয়ে তক্তাপোষেই শুয়ে পড়ল। তখন বাজ পড়ার আকাশ-ভাঙা শব্দ, বৃষ্টি এলো আরও ঝেঁপে। কেমন ভয় লাগছিল সরলার—বিশ্বসংসার ভেসে যাবে নাকি ! ভাসাভাসির কথা মনে এলে যে বুকের মধ্যে থরহরি কম্পমান। দুঃশাসন মানুষটার কিন্তু তখন কেমন নাক ডাকছে, শুতে না শুতেই ঘুম। অমন শেল বেঁধানো কথা বলেও কোন অনুতাপ নেই।

গিরিধারীর খাটালে তিনটে গরু তিনটে মোষ। সেই খাটাল বিনি পয়সায় পরিস্কার করে সরলা। শ্রমের বিনিময়ে গোবরটুকু পায় সে, সেই গোবরে ঘুঁটে দিয়ে এই সংসারের খুঁটিটা সামাল দিয়ে রেখেছে সে। কিন্তু এই তিন দিন অঝোর বৃষ্টি, ঘুঁটে শুকোনো চুলোয় যাক জুট মিলের পাঁচিল থেকে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। মাঠের মধ্যে ঢেলে রাখা গোবরও ধুয়ে কাদা। কিন্তু গোবর কাজে লাগুক আর না লাগুক খাটাল তো

সাফ করতেই হবে। কি কষ্টে যে আজ অনেক বেলায় খাটাল পরিস্কার করতে গেছে সে।

অবশ্য আজ সকলেরই দেরী। যদিও ভাবতে ভাবতে গিয়েছিল—এতো দেরী হলো গিরিধারী না গজগজ করে—কিন্তু গিয়ে দেখল তখনও দুধ নেওয়ার বাবুরা কেউই এসে পৌঁছয়নি। দ্রুত হাতে কাজ সারতে লাগল সরলা। খাটালেরই একপাশে টালির চালের ঘরে গিরিধারী তখন খাঁটি দুধে চায়ের পাতা ফোটাচ্ছে জনতা স্টোভে। ভুরভুর গন্ধে সরলার জিভটা কেমন উসলে উঠল। সকালে একফোঁটা চা-ও আজ জোটেনি। ঘরে সব কিছুই বাড়ন্ত। জিভের জলটা যখন ঢোক গিলে ভিতরে চালান করছে সে তখন গিরিধারী বলল—চা পিব্ অ ?

নমাসে ছমাসে কখনও কোনদিন এরকম কথা বলে গিরিধারী, সে কি না করতে পারে ? তাছাড়া এমন শীত ধরানো বর্ষায় অমন অমৃতের মতো চা !

কে জানে এসবের কোন্ অংশটা দেখছে গণেশ। কোথায়ইবা যাচ্ছিল তখন ? কাজ কম্মোতো কিছুই নেই। হয়ত লক্ষণ ঠাকুরের বাড়ী যাচ্ছিল বিয়ে বাড়ীর কাজটাজ কিছু আছে কিনা জানতে। জোগাড়ের কাজে কখনও কখনও গণেশকে নেয় লক্ষণ ঠাকুর।

বর্ষায় এই তিন চার মাস বড় কষ্টে কাটে গণেশের। কাজ থাকেনা। মালবাহী বোট তৈরী আর মেরামতের কাজে মিস্ত্রির হেল্পারের কাজ করে সে। রিপিট মারা থেকে রঙ করা ইস্তক কি না করে সে। কিন্তু এখন বেকার। বর্ষায় সময় মা গঙ্গা কুলে কুলে ভরা, অতএব কাজ বন্ধ। এটা ওটা নানান উঞ্ছবৃত্তি এ সময় করতে হয় গণেশকে।

কিন্তু তাই বলে কি আমি কখনও তোমাকে দূরছাই করছি ? মনে মনে এ কথাটা ভাবতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল সরলা। তোমার মুখ চেয়ে এই সংসারের জন্য উদয়াস্ত খেটে খেটে হাড় মাস কালি করছি। আমার পাঁচুটা লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে, ভালো চাকরি করবে—তখন কি আর আমাকে এমন গতর খাটাতে হবে ? তবু তো মেয়েটার জন্য কিছুই করতে পারিনি। ঐটুকু মেয়েও আমার সংসারের জোয়ালে বাঁধা। বড় হয়ে কি যে করবে। না শেখাতে পারলাম লেখাপড়া না কিছু। উল্টে পাঁপড় বেলে বেলে নড়া ছিঁড়ে দু'পয়সা নিয়ে আসছে। তাও ঢুকে যাচ্ছে এই সংসারে। মায়ের আমার কপালে আমারই মতো হয়তো গতর খাটানো আছে সারা জীবন। আবার তার ওপর হয়তো অপবাদ গঞ্জনা—

আস্তে আস্তে চোখদুটি জলে ভরে উঠেছিল সরলার। সন্ধ্যা থেকে যে যন্ত্রণা কুরে কুরে খাচ্ছিল, দীর্ঘ সময় পার করে সেই যন্ত্রণা গভীর রাত্রিতে অশ্রু হয়ে ঝরছিল। নিঃশব্দে কাঁদছিল সে। যে সামান্যতম শব্দও নিঃশব্দ রাত্রিতে হয়তো শোনা যেত—বৃষ্টি ও বজ্রপাতের দাপট সেটুকুও স্পষ্ট হতে দেয়নি। তারপর তন্দ্রা নাকি ঘুম। ঘুম মানুষের সব দুঃখ হরণ করে, শান্ত করে সব ব্যথা.....

ঘুমের মধ্যে কুল কুড়োনোর স্বপ্ন দেখছিল সরলা।

ব্যাপারটা বুঝতে গণেশের একটু সময় লাগল। সরলা হাঁউমাউ করছে আর অন্ধকারে দিশাহারা হয়ে এটা ওটা নাড়াচাড়া করছে।

—আঃ, থামো থামো—উঠে বসে চেঁচিয়ে উঠল গণেশ—একটু থামো, আগে লম্পোটা জ্বালো, দেশলাই কোথা—

নিজেই হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই বার করল সে, মশারির বাইরে এসে কাঠি জ্বালল, জলন্ত কাঠিটা এগিয়ে ধরে বলল—কই লম্পটা দাও।

—লম্পটা তো মেঝেতে ছিল—কান্না কান্না গলায় বলল সরলা—এইতো এখানটায়, কিন্তু

—বিছানা থেকে নামল গণেশ, লুঙ্গিটা কোমরের কাছে কিছুটা গুঁজে নিল, আর একটা কাঠি জ্বালল, কাঠির আলোয় সাবধানে এদিক ওদিক দেখতে লাগল।

লম্পটা জলে ভেসে সরে গিয়ে তক্তাপোষের পায়ায় ঠেকে আছে, ওটাকে তুলে নিয়ে জ্বালাতে পারল সে, আলোটা জানালার ওপর রাখল।

—জলে সব ভিজে গেল, কি করি আমি, কি করি—অসহায় সরলা ছটফট করছিল।

—তুমি থামো, একটু থামো—গণেশ বলল—মশারিটা আগে খোলো, খুলে গুটিয়ে রাখো, লক্ষ্মী, বিছানাটা সবশুদ্ধ ধরে গুটিয়ে দে তো, পাঁচু, ওধারে সরে যা।

মশারি বিছানা গুটিয়ে তক্তাপোষের এককোণে রাখল লক্ষ্মী।

—নাও, এবার জিনিষপত্র একে একে ওপরে তোল—বলল গণেশ।

জিনিস বলতে নানান ডিবে ডাবরা। তার কোনটা চালের কোনটা আটার কোনটা মশলার—সবই ফাঁকা। একে একে সেগুলো তুলল সরলা, বাসনপত্র দুচারখানা—তাও তুলল।

—মা, আমার পাঁপড়ের টিন ? লক্ষ্মী বলল।

—মা, আমার বই খাতা—পাঁচু বলল।

বেলা আবেলা সব পাঁপড় আর লেচি একটা ঢাকা টিনের মধ্যে রাখে লক্ষ্মী। গরীবের সংসারে কিছু আশ্রিত আছে ইঁদুর আরশোলা—ঢাকায় না রাখলে তারা সব শেষ করে দেবে। পরের জিনিস, লক্ষীতো শুধু বেলার মজুরী পায়। নষ্ট করলে আর দেবেই না কাজ। তা টিনটা থাকে তক্তাপোষের নীচে। নীচু হয়ে টিনটা বার করল গণেশ। ওটার কিছু অংশ জলে ডুবে ছিল—তাড়াতাড়ি খুলে হাত ঢুকিয়ে দেখল লক্ষী।

—যাক বাবা, জল ঢোকেনি—হাঁফ ছাড়ল সে, টিনটা তক্তাপোষের একদিকে গুছিয়ে রাখল।

কাঠের ফালি পেরেক মেরে তৈরী একটা ছোট তাক পাঁচ টাকায় কিনেছিল গণেশ, সেটিতে পাঁচুর বই খাতা থাকে, আর নানা টুকিটাকি সংগ্রহ—সবসমেত তাকটা তুলল গণেশ। নীচের থাকের কিছু ভিজেছে। কি যেন একটা ঝুপ করে পড়ে গেল তাক থেকে।

—লাটু, বাবা আমার লাটু—চেঁচিয়ে উঠল পাঁচু—গণেশ জলে হাত ডোবাল।

—কেরোসিন—গিন্নিমার আর আমাদের টিনটা—হঠাৎ মনে পড়ায় সরলা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল তক্তাপোষের নীচে। গিন্নিমার কেরোসিন পলিথিনের মুখবন্ধ জ্যারিকেনে ঠিকই আছে কিন্তু সরলার কেরোসিনের টিন যদিও মুখ বন্ধ তবু জল ঢুকেছে খানিক—ও দুটোও তুলল সে।

সমস্ত বাড়ীর ঘরে ঘরে কলরব। শুধু এই বাড়ীটার কেন, বলাই মিস্ত্রি লেনের এই বিশাল বস্তীর সব বাড়ীতেই কলরব। যেন এক বিশাল বৃক্ষের শাখায় শাখায় আশ্রিত পাখীরা এই প্রবল দুর্যোগে আর্তস্বরে ডাকাডাকি করছে। বৃষ্টির প্রবল শব্দও সে আর্তরব চাপা দিতে পারছিল না, অতঃপর মেঘ হুঙ্কার দিয়ে দিয়ে তাদের দমাতে চাইছিল।

এই ঘরে চারটি প্রাণীর কণ্ঠস্বর একেবারেই দমে গেছে। তক্তাপোষের ওপর স্তূপীকৃত জিনিসের একধারে বসেছিল চারজন—নিশ্চুপ অনড়। চারজনই তাকিয়েছিল জানালার ওপর রাখা লম্পটার দিকে। একমাত্র লম্পর শিখাটাই নড়াচড়া করছিল, নড়াচড়া করে ধোঁয়া ছড়াচ্ছিল।

হাঁটুতে মুখ গুঁজে সহসা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সরলা—আবার ভেসে গেলাম, হায় মা গো, আমরা কোথায় যাবো গো...

নিবাস কুসুমপুর, মাতঙ্গী নদীর তীরে। যেখানে দেয়ালী ঘরে খড়ের চালেতে ছিল সতেজ লাউয়ের গাছ, নিকানো উঠানে তুলসীর মঞ্চ ছিল আর ছিল এক প্রিয় টিয়াপাখী দুলত মনের সুখে চালের বাতায় ঝোলান খাঁচায়। আর ছিল আঙিনায় এক কোণে বাতাবী লেবুর গাছ, ফাগুনে নতুন ফুলে তীব্র সুগন্ধ দিত। লাউয়ের ডগার মতো সতেজ সুন্দর দুটি হাতে সরলা তখন সারাদিন ব্যস্ত কত সংসারের কাজে। কিষাণ গণেশের ছিল একটুকু জমি—শস্যক্ষেত্র, আর ছিল বলিষ্ঠ শরীর। অন্নের সংস্থান ছিল, প্রেম ছিল, সুখ ছিল।

বর্ষণ চাষীর কাছে সুখের সম্ভার। আর মাতঙ্গীর জলোচ্ছাস—সে তো বর্ষার বর্ষসঙ্গী—ওতে আর ভয়ের কি আছে !

কিন্তু এলো, ভয়ঙ্কর বন্যা এক এলো, এমনটি গণেশ জীবনে দেখেনি। তার মাটির দেয়ালী ঘর ভেঙে খড়ের চাল ভাসিয়ে নিয়ে জল ছুটল কলকল খলখল—ভয়ঙ্কর সর্বনাশী কে কোথায় গেল কোথায় হারাল...

লক্ষী তখন গর্ভে। ভরা পোয়াতিকে নিয়ে কিভাবে যে গণেশ সেদিন মাইল-খানেক দূরের বাঁধে এসে উঠতে পেরেছিল। ঘর ছেড়ে বেরোনোর সময় নিঃশব্দে টিয়াপাখীটাকে ছেড়ে দিয়ে সরলাকে শুধু বলেছিল—সরল, মুঠো শক্ত রাখবি, কিছুতেই যেন আমার কোমরের কসি না ছাড়ে।

বাঁধের ওপরও তখন পা ফেলার জায়গা নেই। মানুষে গরুতে ছাগলে নানান জিনিসপত্রে বৃষ্টিতে জলেতে কাদায় সব একাকার। দমে যেতে যেতে গণেশের শরীরে

আমোঘ শক্তি, মস্তিষ্কের কোষে কোষে বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো কিছু—যেভাবে হোক এগিয়ে যেতে হবে—পেরিয়ে যেতে হবে এই পথ—পায়ের নীচে যখন মাটি পাওয়া গেছে—ভেঙে পড়িস না সরল, আমার শক্ত কাঁধে ভর দে, কিন্তু হাঁট। যেভাবে হোক আমাদের পৌঁছতেই হবে ইষ্টিশনে।

আসলে গণেশের লক্ষ্য ছিল সদর। কোনরকমে যদি হাসপাতালে তুলে দিতে পারে সরলাকে তাহলে নিশ্চিন্তি। নিজের জন্য কোনো চিন্তা নেই, রাস্তার ধার কিংবা গাছতলা—যাই হোক।

পৌঁছতে পেরেছিল তারা। সরলার তখন জ্বরে গা আগুন। হাসপাতালে কে নেবে? অতই সহজ? বাইরের বারান্দায় পড়ে কেটেছিল দুদিন, খাদ্য—মুড়ি আর জল। তারপর প্রসব বেদনা। সে কি অসহ্য সময় ! বাধ্য হয়ে ভর্তি করল ডাক্তারবাবু। গণেশের মাথা থেকে নেমে গেল গুরুভার।

নদীর অতল গর্ভে চলে গেছে নিবাস কুসুমপুর গ্রাম......সেখানে কলকল হাস্যে খেলা করে জল...তারপর কত ঘাটে ভাসতে ভাসতে শেষে হাওড়ার বলাই মিস্ত্রি লেনে বস্তির একখানা ঘরে গণেশের ঘর সরলার সংসার...

মেঘের ধমক ঢেকে দিল সরলার হাহাকার। সরলার কান্না দেখতে দেখতে গণেশের বুকেও কান্না। তার সরলা—সেই কোমল সরলা—যে তার কোমরের কসি শক্ত করে ধরে পার হয়ে এসেছিল ঘন সেই দুর্যোগের পথ....তখন সরলার হাত দুটি কি নরম ছিল, আর চোখদুটি ভাসাভাসা, আর গালে ছিল প্রতিমার মতো চিকন আভা, আর হাঁটু ছোঁয়া চুলের রাশি। সেদিন সেই দুর্যোগের পথ পার হতে গিয়ে আকুল হয়ে কেঁদেছিল কোমল সরলা, তারপর এত দীর্ঘ দিন আর সে কখনও কাঁদেনি। এই সংসারের চাকা কিভাবে নিংড়েছে সরলাকে। কোথায় তার সেই কোমল হাত, কোথায় সেই চিকন মুখ আর ঘন চুলের রাশি। দিনান্তে এখন রোজ একবার চুলে চিরুনি দিয়ে উঠতে পারে কি সরল ? কিন্তু এই রুক্ষ কঠিন সরলা আজ সেদিনের সেই কোমল সরলার মতই কান্নায় আকুল।

দেখতে দেখতে আজকের ক্ষয়ে যাওয়া গণেশের বুকের মধ্যে জেগে উঠল একদার সেই বলিষ্ঠ গণেশ—যে তার সরলকে বুকে আঁকড়ে সব দুর্যোগ অবহেলায় অতিক্রম করেছিল। সরলার পিঠে আলতো হাত রাখল সে, বলল—কাঁদিসনে সরল, ভয় কি, আমি তো আছি।

দিশেহারা সরলার মনে কিন্তু সহসা বাঁকা ভাব, পিঠ বাঁকিয়ে গণেশের স্পর্শ এড়াতে চাইল সে, মনে যে বিঁধে আছে গণেশের অপবাদ অপমান।

গণেশ বুঝতে পারে। সরলার মনের কথা সে বুঝবে না একি হয় !

কিন্তু—

সতেজ গণেশের মধ্যে পুনরায় ফিরে আসে ক্ষয়প্রাপ্ত আজকের মানুষ—যার মনে হয় তিনটে তেজিয়াল গরু আর তিনটে পাহাড়ের মতো মোষের মালিক স্বাস্থ্যবান গিরিধারী তার প্রতিদ্বন্দ্বী।

সকালে যখন একটুকরো পলিথিনের চাদর গায়ে মাথায় জড়িয়ে খাটাল পরিষ্কার করতে বেরিয়ে যাচ্ছিল সরলা, গণেশ বলেছিল—একটু চা-ও মুখে দিয়ে গেলি না—

আসলে তার নিজের প্রাণটা তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিল একটু উষ্ণ পানীয়র জন্য। তারপর কাজের ধাক্কায় বেরিয়ে পথে যেতে যেতে চোখে পড়ল—

স্পর্শ এড়াতে চাওয়া সরলার পিঠ থেকে হাত সরিয়ে নিল গণেশ, অভিমানে বলল—আমাকে একটুক না দিয়ে তুই চা খেতে পারলি সরল ?

সরলার বুকের মধ্যে কি বজ্রপতন ? অমন শিউরে উঠল কেন সে ?

এত বৃষ্টির মধ্যেও কোথায় যেন কাক ডেকে উঠল। শহরের একমাত্র পাখী সকালকে আহ্বান জানাল।

বনবাসী

কত তুচ্ছ জিনিস মানুষ আঁকড়ে রাখে ! অথচ অন্যের কাছে তা মূল্যহীন। টেবিলের ওপর জমা করে রাখা বাবার ঐ যে সব বইপত্র খাতা, কাগজের টুকরোটি পর্যন্ত—বাবার কাছে কত মূল্যবান বস্তু ছিল। কেউ একটু হাত দিতে গেলে এমনকি ধুলো ঝাড়তে গেলেও বাবা হাঁ হাঁ করে উঠতেন। অথচ এখন সব মূল্যহীন। মানুষ চলে গেলে তার ফেলে যাওয়া জিনিসগুলি কিন্তু তেমনই থাকে—কিছুদিন, তারপর....

আমি সেই তারপরের কাজই করব ভাবছিলাম। দীর্ঘ রোগভোগের পর বাবা মারা গেছেন। শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে গেছে সেও মাসখানেক হলো—এতদিন টেবিলের জিনিসপত্র একইভাবে পড়েছিল, কয়েকদিন ধরেই মনে হচ্ছে এই ধুলিধূসরিত বইখাতা এগুলি পরিস্কার করে ফেলাই ভাল। পরিস্কার মানে—অধিকাংশই ফেলে দেওয়া, দু-চারখানা বই না হয় কোথাও রেখে দেওয়া যায়, তাও ক্রমশঃ হারিয়ে যাবে, কেননা বইগুলি গল্প উপন্যাসও নয়—ধর্মপুস্তক, আর আছে—আত্মা, ইহকাল, পরকাল, ইত্যাদি সম্বন্ধীয় বই—কিন্তু মাকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার। হয়তো মায়ের মনে আঘাত লাগতে পারে ! রিটায়ার করার পর বাবা এগুলি সঙ্গে এনেছিলেন, টেবিলে সাজিয়ে রেখেছিলেন।

দীর্ঘ দিন বাবা রোগভোগ করলেন। অথচ কি যে রোগ তার কোন নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই। শুধু ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যাওয়া, অথর্ব...। অথচ অথর্ব হওয়ার বয়স বাবার নয়। মাত্র পঁয়ষট্টি বছর বয়সে এভাবে কেউ অথর্ব হয় না। আসলে চাকুরী থেকে অবসর নেওয়ার পর সেই যে বাবা হাওড়া শহরের এই বাড়ীতে এসে বসলেন তারপর থেকেই ক্রমশঃ অসুস্থ।

রেলের চাকুরীতে বাবা ছোটখাট জঙ্গুলে স্টেশনে থাকতেই ভালবাসতেন। লোকে বদলি হলে শহরে আসতে চান কিন্তু বাবা ঠিক তার উল্টো, খুঁজে খুঁজে তিনি চলে যেতেন যত সব...। মাও সঙ্গে—। আর তাই বোধহয় বাবা রিটায়ার করে এই শহরে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি কিন্তু ছোটবেলা থেকেই জেঠামশায়-জেঠিমার কাছে। জেঠতুতো ভাইবোনেদের সাথে মানুষ। বড় হওয়া লেখাপড়া শেখা—। অসলে জঙ্গুলে রাজত্বে থাকতে ভালবাসলেও ছেলের লেখাপড়া ইত্যাদি যে শহর ছাড়া হবে না, তাই বোধহয় বাবা আমাকে—

দীর্ঘ চার বছর বাবা অসুস্থ ছিলেন, অর্থাৎ চাকুরি শেষে বাড়ী এসে বছর খানেক মোটমুটি একটু—তাও—

এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে আমি বাবার টেবিলের ওপর জমা করা কাগজপত্র বইখাতা ইত্যাদির ধুলো ঝাড়ছিলাম, তখন মা ঘরে এসে ঢুকলেন, বললেন কি করছিস?

আমি অস্বস্তি বোধ করলাম, মা কি দুঃখ পাবেন ? মা কি চাইছেন এগুলো এভাবেই থাক ?

—না একটু উল্টে পাল্টে দেখছিলাম—আমি বললাম—এই বইগুলো বাবার খুব প্রিয় ছিল। মাঝে মাঝে আমাকে কাছে বসিয়ে কতসব কথা বলতেন, কিছুই বুঝতাম না...

—আমাকেও বলতেন।

—তুমি কিছু বুঝতে মা ?

—বোঝার তো কিছু নেই, সবই বিশ্বাস—মা বললেন—ধুলো ঝেড়ে আমি একসময় ভাল করে গুছিয়ে রাখবোখন তখন না হয় পড়িস—বলে মা বেরিয়ে গেলেন।

বুঝলাম মা এগুলি যত্ন করেই রাখতে চান, সুতরাং ফেলে দেওয়ার ইচ্ছা করা উচিত নয়। অগত্যা এক একটি বই, খাতা, লেখায় ভরা ফুলস্কেপ কাগজ তুলে নিয়ে ধুলো ঝেড়ে সাজিয়ে রাখতে লাগলাম। এভাবে কখনও কখনও কোন বইয়ের পাতা উল্টে দেখছিলাম, কখনও খাতার বা কাগজের লেখা পড়ছিলাম...

...মাঝে মাঝে বাবা আমাকে কাছে বসিয়ে কতসব কথা বলতেন... আমি কিছুই বুঝতাম না বা বুঝতে চেষ্টা করতাম না বলা যায়, শুধু বাবার মন রাখতে মনোযোগ দিয়ে শোনার ভান করা...

পরমাত্মা, জীবাত্মা, পুনর্জন্ম...এইসব টুকরো শব্দ কিছু শ্রবণের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে মনে গেঁথেছিল...আরেকটা শব্দ—বাসাংসি জীর্ণানি...কি যেন সংস্কৃত শ্লোক শুধু প্রথম শব্দ দুটো মনে আছে...বাবা বলতেন—বসন জীর্ণ হয়ে এল, বুঝলে তরুনাথ—এবার আত্মা এই জীর্ণ বসন ছেড়ে নতুন বসন পরিধান করবে।

এটুকু বুঝি বাবা বসন বলতে নিজের শরীরের কথা বলতেন, শরীর জীর্ণ হলো এবার আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করবে। কিন্তু নতুন বসন—মানে নতুন শরীর গ্রহণ করবে—এ কি আর তিরিশ বছর বয়সের যুবার মনঃপুত হয় ! কিন্তু আমি বিশ্বাসযোগ্যভাবে মাথা নাড়তাম। আসলে বাবার সঙ্গে আমার মেলামেশা ঘনিষ্ঠতা কিছুই হয়নি, বাবা আমার চিরকালই দূরের মানুষ, অবশ্য মাও চিরকাল দূরে—তবু মা পৃথিবীতে সন্তানের কাছে এক এবং একমাত্র বিশেষ...

...এই কাগজটা দেখছি নতুন কাগজ, যদিও হাতের লেখাটা খুব আঁকাবাঁকা, হয়তো মৃত্যুর কয়েকদিন আগে লেখা—

...আত্মা কখনো জীর্ণ হয় না, অসুস্থ হয় না, জরাগ্রস্ত হয় না। আত্মাকে অস্ত্র ছেদন করতে পারে না, অগ্নি দহন করতে পারে না, সে অজর অমর...অতঃপর নবীন শরীরে প্রবেশ...পুনর্জন্ম...ধুলো ঝেড়ে রেখে দিলাম সাজিয়ে।

এই খাতাটা দেখছি খুবই পুরোনো, পাতাগুলি লালচে হয়ে গেছে, কিন্তু বাবার হাতের লেখা তখন কত সুন্দর ছিল ! কত যত্নে লেখা ! এইসব খাতা, বই, কাগজগুলি বাবার কত প্রিয় ছিল। কেউ হাত দিতে গেলে—এমনকি মা যদি একটু গুছিয়ে রাখতে চাইত—বাবা হাঁ হাঁ করে উঠতেন, বলতেন—ওসব হাত দিও না, হাত দিও না—

মা বলত—একটু গুছিয়ে রাখছি তো !

—থাক থাক, ও আমি গুছিয়ে রাখব'খন—

অথচ এখন...গাছেদের ঝরে যাওয়া পাতার মতন মূল্যহীন...কিন্তু এগুলি কি ডায়েরী? না, সাল তারিখ দিয়ে প্রত্যহের রোজনামচা এ নয়, একি আত্মকথন ?

এ লেখাটা দেখছি বড় অদ্ভুতভাবে শুরু হয়েছে—

...ঠাকুর দেবতা, ধর্মবিশ্বাস, ভক্তি অভক্তি, এসব নিয়ে কখনো ভাবিনি, কখনো ভাবিনি ভাগ্যফল কর্মফলের কথা। গ্রহ, নক্ষত্রের পাকচক্রে নিয়ন্ত্রিত জীবন,—এসব বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা দূরে থাক কোনোদিন মনের মধ্যে উদয় হয়নি। পরীক্ষার সময় কিংবা চাকুরীরর ইন্টারভিউ দিতে যাবার আগে ঠাকুর প্রণাম, কিংবা কোনো পূজাপার্বণে মায়ের হাত থেকে বাধ্য ছেলে হয়ে প্রসাদ নেওয়া—এর বেশী কখনো কিছু করিনি। কিন্তু এখন আমি অনেক কিছুই ভাবি।

যেমন আজ সকাল থেকে আমি তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী লক্ষকোটি গ্রহনক্ষত্র, সকলের কাছে মনে মনে প্রণাম জানাচ্ছি আর আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি—আমি যেন সক্ষম হই !

আজ দুপুরে ডাক্তারবাবু জানাবেন আমি সন্তান উৎপাদনে সক্ষম কি-না।

আচ্ছা, পরীক্ষা তো কালকেই হয়ে গেছে, রিপোর্টও লেখা হয়ে খামে ভরা হয়ে গেছে, আজ সকালে এতক্ষণে সেই খাম ডাক্তারবাবুর কাছে পৌঁছে গেছে, শুধু আমার পৌঁছানোর অপেক্ষা—তাহলে ? এত প্রার্থনা কেন ? আমার আকুল প্রার্থনা কি কাগজের লেখাকে পাল্টে দিতে পারবে ?

যদিও আমরা দুজনেই নিশ্চিত—রিপোর্টে নেতিবাচক কিছু থাকাই সম্ভব, কারণ প্রথম পরীক্ষা করা হয়েছে সরমাকে এবং পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ—তার শরীরে কোথাও কোনো ক্রুটি নেই।

তাহলে ক্রুটি নিশ্চয় আমার। তবু আমি প্রতিদিন প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করে যাই, এবং আজ সকাল থেকে সে প্রার্থনার আকুলতা বুঝি আচ্ছাদিত করবে ওই বিশাল আকাশ।

পনেরো দিনের ছুটি শেষ হয়ে গেল। এই ছুটি ছিল আমাদের অগ্নি পরীক্ষার ছুটি, —সরমা ও আমার। পরীক্ষায় আমরা দুজনেই উত্তীর্ণ, তবু আমাদের মনে আনন্দ নেই। জীবনে আনন্দের ব্যাখ্যা কি ? বিবাহের পর প্রথম একটা বছর যেভাবে কেটেছে সেটাই কি আনন্দের প্রতীক ? তখন অন্ততঃ মনে হয়েছিল তাই বুঝি। কিন্তু আজ জীবনে আনন্দের সংজ্ঞা বদলে গিয়েছে, আজ আনন্দের প্রতীক একটি শিশু, দুজনের একান্ত ইচ্ছায় তিল তিল করে বেড়ে ওঠা সন্তান, সেই সন্তানের অভাবেই জীবন হয়ে উঠেছে বিষময়।

ডাক্তারের রিপোর্ট—আমাদের দুজনেরই কোনো খুঁত নেই, তাহলে ? তাহলে তো দুজনেই খুশী হওয়া উচিত ? কিন্তু তা কি করে হওয়া সম্ভব ? তাহলে বিবাহের পর পাঁচটা বছর কেটে গেল তবু সন্তান এলো না কেন ? অবস্থা তো আরও জটিল হয়ে

গেল ! এর চেয়ে বরং দুজনের মধ্যে কারও খুঁত ধরা পড়া ভাল ছিল, তাহলে অন্ততঃ কারণ জানা যেত, অন্ততঃ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেত।

আগামীকাল আমরা চলে যাবো। পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এসেছে বদলিরও আদেশ পত্র। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক প্রথা।

কিন্তু বাক্স গোছানোয় সরমার দেখছি মন নেই। অন্যমনস্ক বসে অছে জানলার ধারে।

সরমা এরকম অন্যমনস্কভাবে বসে থাকলে আমি কিছু বলতে ভয় পাই। কিন্তু এখন না বলেই উপায় কি ? গোছগাছ না করে ফেললে—নতুন জায়গায় চলেছি, তাছাড়া সেটা একেবারে পাণ্ডব বর্জিত জায়গা, কত কিছু নেওয়ার আছে ! সুতরাং সরমাকে একটু তাগাদা দিতেই হলো, যদিও মৃদুভাবেই বললাম।

সরমা আমার কথায় গা না দিয়ে সহসা বলল—তুমি কি সত্যি কথা বলছ ?

—সত্যি কথা মানে ? কিসের ? আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—ওই যে ডাক্তারবাবু তোমার সম্বন্ধে যা বলেছে ? সরমা সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করল।

আমি নিরুত্তর। সরমা আমাকে সন্দেহ করছে, হয়তো আমি মিথ্যা কথা বলেছি।

এই বেদনা নিঃশব্দে বহন করা ছাড়া আমি আর কি করতে পারি। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

আমাদের এই বিশাল বাড়ীর ঘরে ঘরে সবসময় হৈচৈ। বাবা কাকা জেঠামশায়ের সন্তান-সন্ততি নিয়ে যৌথ পরিবারের মেলার আসরে আমি কিন্তু দিনে দিনে বড় একা হয়ে যাচ্ছি।

বারান্দায় মায়ের মুখোমুখি। দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়ে মা ফিরলেন। সরমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ও রাজি হয়নি।

—এই মাদুলি দুটো গুরুদেব তৈরী করে দিয়েছেন, দক্ষিণেশ্বরে মায়ের পায়ে নিবেদন করে আনলাম, একটা তুই পারবি, আরেকটা বৌমা। বৌমাকে মাদুলিটা মাথার ওপর চুলে বেঁধে রাখতে বলেছেন গুরুদেব।

আমি বুঝতে পারছিলাম বিরক্তির ভাব আমার মুখে ছায়া ফেলছে। মা বুঝতে পারলেন, বললেন—সবকিছু কি বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা যায় বাবা ! অনেক কিছু না বুঝেও মেনে নিতে হয়। না হলে রাস্তা-ঘাটে ভিখিরিদেরও গণ্ডা গণ্ডা বাচ্ছা হচ্ছে অথচ তোদের সবকিছু ঠিকঠাক থেকেও হচ্ছে না কেন ? যাকগে আমি আর বেশী তর্ক করতে চাই না, কাল চলে যাচ্ছিস, মায়ের প্রসাদী ফুল দিয়ে মুড়ে বেঁধে দিলাম, বাক্সে গুছিয়ে নে, ওখানে গিয়ে স্নান করে পরে নিস্।

সকালে যখন ট্রেন থেকে নামলাম তখন সবে সূর্য উঠি উঠি করছে। আমরা ছাড়া আর কোনো তৃতীয় ব্যক্তি ট্রেন থেকে নামেনি। ট্রেন চলে গেল, আর দেখলাম কি নিঝুম

নির্জন পৃথিবীতে আমরা এসে পৌঁছেছি। প্ল্যাটফরমে ফ্ল্যাগ হাতে দাঁড়ানো মানুষটি হাস্যমুখে এগিয়ে এলেন, বললেন—মনে হচ্ছে আপনিই নতুন স্টেশন মাস্টার?

আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম। — ক'দিন ধরেই আপনার আসার প্রতীক্ষা করছি। আর পারা যায় না মশাই ! কি বলব, আপনি এসে আমায় মুক্তি দিলেন। কাল থেকেই চেষ্টা করে দিন কি করে আবার বদলি হবেন। কইরে, কোথায় গেলি—ভরত—এই যে তোর নতুন মাস্টারবাবু এসে গেছেন, নে, বাক্স-টাক্সগুলো ধর। দু'টো বছর যে কিভাবে কাটল !

ওনাকে খুবই আনন্দিত আহ্লাদিত মনে হচ্ছিল, জেলখানা থেকে ছাড়া পাচ্ছেন বুঝি। অথচ কি দুরন্ত মুক্তি এখানে ! দক্ষিণে যতদূর চোখ যায় উঁচু-নীচু অনন্ত প্রান্তর, প্রান্তরের শেষে নীল নীল পাহাড়ের আভাস। আবার উত্তরে তাকালে মাঠের মধ্যে ছড়ানো বৃক্ষেরা যেন খেলতে নেমেছে, তারপর ক্রমশঃ ঘন বৃক্ষসারি, তারপর গাছে ঢাকা পাহাড়েরা, সেইসব পাহাড়ের মাঝ দিয়ে দেখা যায় আরও দূরের আবছা পাহাড়দের। পূর্ব দিক থেকে ছুটে এসেছে রেল লাইন—পশ্চিম দিকে ওই দূরে কোথায় হারিয়ে গেছে বনমাঝে।

কিন্তু সভ্য মানুষেরা এ-মুক্তি চায় না, তাদের চাওয়া—

—এ বেলাটা মশাই আমার ওখানেই খাবেন। চর্বচোষ্য কিছু খাওয়াতে পারব না, ওই যাহোক এক তরকারি ভাত নিজেই রাঁধবো। অর্ধাঙ্গিনী ছেলেপুলে নিয়ে অনেকদিন আগেই পালিয়েছে, কি কষ্টে যে আছি !

সত্যিই তো ! এখানে কোথায় বাজার দোকান ? কি করে সব ব্যবস্থা হবে ! আছে নিশ্চয়, না হলে আর চলছে কি করে !

—আপনি সারাদিন তবু কাজেকম্মে ব্যস্ত থাকবেন, মুশকিল হবে বউমার। ছেলে-পুলেদের রেখে এসেছেন দেখছি।

আমরা দুজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম এগিয়ে যেতে।

সকালে আপে একটা গাড়ী—যে গাড়ীতে আমরা এসেছিলাম। তারপর ন'টার সময় ডাউনে একটা গাড়ী এখানে থামে। আবার সেই সন্ধ্যায় একটা গাড়ী থামে ডাউনে। সারাদিন-রাতে আর কোনো গাড়ী এ স্টেশনে দাঁড়ায় না। অবশ্য সারাদিন অনেক গাড়ীই এ লাইন দিয়ে যাতায়াত করে, কিন্তু তাদের শুধু সবুজ পতাকা উড়িয়ে চলে যেতে দিতে হয়। যাত্রীসংখ্যা শূন্য থেকে দশের মধ্যে ঘোরাফেরা।

যদি বিয়ের পর পরই এখানে আসা হতো ! কিন্তু তখন আমি ছিলাম হাওড়ায় কাছাকাছি এক স্টেশনে, সহকারী পদে, অতএব বাড়ীতেই থাকা। যৌথ পরিবারের হট্টমেলায় অনেক বিধিনিষেধের বেড়া। তবু কি মধুর ছিল সেইসব দিন...আজ এই নির্জন ভূমে...নিজস্ব কথা বলার জন্য আছে মাত্র দুটি প্রাণী অথচ তাদের পরস্পর বলার

মতো কোনো কথা নেই। দেখতে দেখতে তিনটে মাস কেটে গেল, এমনও এক একদিন যায় 'এক গ্লাস জল দাও' এটুকু কথা বলারও প্রয়োজন হয় না।

মাথায় মাদুলিটা সরমা বেঁধেছে। দেখলে আমারই হাসি পায়। ভাগ্যিস এখানে দেখার কেউ নেই, থাকলে হয়তো পাগল ভাবত। রাত্রে বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে থাকি যেন লাশকাটা ঘরে পড়ে থাকা দুটি মৃতদেহ। ব্যবচ্ছেদ করে কি দেখা হবে ?

ভরত এখন আমার একমাত্র সঙ্গী। সারাদিন ওর সঙ্গে যত কথা। ও শুধু রেলের কর্মচারী নয় আমার ডান হাত বাঁহাত সবই হয়ে উঠেছে। অবশ্য যিনিই এখানে আসেন তাঁরই জন্য ভরত। ওর বাড়ী ওই যে গাছে মোড়া পাহাড়গুলি দেখা যায় তারও ওপারে ওই যে আবছা পাহাড়সারি—ওইখানে। ওইখানে চারপাশে পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝে এক ছোট্ট গ্রাম, সেখানে আছে ওর ছোট্ট ক্ষেত জমিন, সে জমিনে চাষ করে ওর বড় ছেলে। ছোলা হয় ভুট্টা হয়। ও দু-একদিনের জন্য বাড়ী যায়।

আশ্চর্য ! ওই জঙ্গলের মধ্যেও আছে মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। কাছাকাছি গ্রাম থেকে ভরত আমাদের জন্য কিনে আনে জিনিষপত্র, নিজের জন্যও আনে, রান্নাবান্না করে খায়-দায় আর কাজ করে, আর বোধহয় অপেক্ষা করে মাসের শেষের, মাইনে পাবে, ঘরে যাবে।

ভরত বলে—ঘর যাবো !

ঘর যাওয়ার দুদিন আগে থেকে ওর মধ্যে কি এক ব্যাকুলতা কাজ করে দেখি। নিজের মানুষের কাছে যাওয়ার ব্যাকুলতা !

কিন্তু আমি ? নিজের মানুষের কাছেই নির্বাসিত এক নির্জীব প্রাণ...

আসলে এসব দেওয়াল সরমারই সৃষ্টি। সন্তান নেই—এজন্য একটু অভাববোধ হয়ত আমার মধ্যে আছে কিন্তু সেটা বিশাল এক যন্ত্রণার পাহাড় হয়ে বুকে চেপে বসে না—যেমনটি সরমার ! আসলে সন্তান মেয়েদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য সত্তার যেটা হয়ত পুরুষের নয়...

প্রকৃতি এখানে নিজস্ব রূপে রূপময়। মানুষের আগ্রাসী হাত শুধু একচিলতে রেললাইনের জমিটুকুই গ্রাস করতে পেরেছে, এছাড়া যতদূর দৃষ্টি যায় মনে হয় পৃথিবী আদিমকাল থেকে আপন মনে যেমনটি সাজতে চেয়েছে তেমনই সেজে রয়েছে, কেউ তার প্রসাধনে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। এখানে এসে অবধি আমার মনে হয়েছে এমন একটি স্থানে পৌঁছানর জন্যই আমি ভেতরে ভেতরে আকুল হয়েছিলুম।

জন্ম থেকে আমি বেড়ে উঠেছি যে ঘিঞ্জি পরিবেশে সেই ঘনবদ্ধ বাড়ীগুলি আর তার আশাপাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বদ্ধ নর্দমাগুলি যা থেকে সারাক্ষণ উঠে আসে বদ গন্ধ, গলি ও রাস্তার বাঁকে বাঁকে ডাস্টবিন পুতিগন্ধময়—কোথাও কোনো সুবাস নেই—না।

এভাবেই জন্মাবিধি বেড়ে উঠে তবু আমার মধ্যে কেন এত তৃষ্ণা জন্মেছিল ? এমনতো নয় যে আমি এমনই মুক্ত প্রকৃতির কোলের মানুষ, উপড়ে নেওয়া চারাগাছের মতো আমাকে কেউ নিয়ে গিয়ে রোপন করেছিল ওই পরিবেশে ! এবং আমার ওই শহরের জীবনে কখনও তো মনে জাগেনি এমন অভাববোধ !

অবসর সময়ে আমি নেমে যাই মাঠে, উঁচু নীচু জমি—কোথাও মাটি কোথাও পাথর, কোথাও গুচ্ছগুচ্ছ ঘাস কোথাও বা কাঁটাঝোপ, মাঝখানে কোথাও বা একেবারে একা দাঁড়িয়ে একটা অচেনা বয়স্ক বৃক্ষ ! আমি বসে পড়ি নিস্তব্ধ নিঝুম চরাচরে, আমার স্নায়ুতে ছড়িয়ে যায় কি এক আশ্চর্য উত্তেজনা যা আমি কখনও অনুভব করিনি আমার পূর্ব জীবনে।

কিন্তু আমি যখন ঘরে ফিরি...যত কাছে আসি আমার পাগুলি ক্রমশঃ ভারী হয়ে ওঠে, শরীর অসাড় হতে চায়...

সরমা যদি একটু স্বাভাবিক একটু প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারত তাহলে আমাদের জীবন এখানে অমৃতময় হয়ে যেত...

আত্মকথন দেখছি ক্রমশঃ একটা নেশার মত আমাকে আচ্ছন্ন করছে। বিশেষতঃ স্টেশনের ঘরে বসে দীর্ঘ সময় যখন কোনো কাজ নেই তখন খাতাটা নিয়ে লিখতে বসলে নেশাটা আরও গভীরে ছড়িয়ে যায়...। আমার ডানদিকে জানালার ওপারেই শুয়ে আছে বন্য প্রান্তর...এসময় মনে হয় আমি বড় সুখে আছি...

গত রাত্রে প্রত্যহের মতই যখন ঘুম আসছিল না এবং আমি বুঝতে পারছিলাম সরমাও যথারীতি ঘুমায়নি, আমি আপন মনে কথা বলতে শুরু করলাম।

...পৃথিবীতে সবাই কি সব কিছু পায় ? বরং পাওয়ার চেয়ে না পাওয়াটাই জীবনে বেশী...তাই যা পাওয়া যায় তাই দিয়েই জীবনকে সাজিয়ে নিতে চেষ্টা করা উচিত। যা পাওয়া যায় না তা নিয়ে হা-হুতাশ করতে থাকলে শুধু দুঃখই বেড়ে ওঠে। অথচ এই হা-হুতাশ কখনই না পাওয়া জিনিসকে এনে দিতে পারে না...

বলতে বলতে কেমন এক আবেগ সঞ্চারিত হচ্ছিল আমার বুকের মধ্যে, গভীর আবেগে বললাম—

সরমা, আমরা দুজন যদি দুজনের অবলম্বন না হই, যদি দুজনে দুজনের দুঃখ ব্যথা না ভুলিয়ে দিই তাহলে সমস্ত জীবন কাটবে কি করে ?

—যে মিথ্যা কথা বলে, ছলনা করে, সে কি করে দুঃখের ভাগ নেবে ?—তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল সরমা।

—মিথ্যা কথা ? কি মিথ্যা কথা ? কিসের ছলনা—? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

—তুমি মিথ্যা বলনি ? ডাক্তারবাবু তোমাকে যা বলেছেন তুমি কি আমাকে তার উল্টো কথা বলনি ?

—উল্টো কথা ? তার মানে তুমি বলতে চাইছ আমি অক্ষম ?

—আমি কিছু বলতে চাইছি না, আমাকে ঘুমোতে দাও।

—ঘুম তোমার অত সহজে আসবে না সরমা,—গভীর বিষাদে আমি বললাম—যদি আসত তাহলে আমি শান্তি পেতাম, আমিও নিশ্চিন্তে ঘুমোতাম। কিন্তু তুমি মিথ্যা চিন্তায় নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলছ, চোখের সামনে আমি দেখছি তুমি কিভাবে নিজেকে ক্ষয় করছ।

—আমি এভাবেই ধীরে ধীরে মরে যেতে চাই।

—সেটাইতো আমার বুকে সারক্ষণ শেল বিঁধছে। আমি তোমাকে ভালবাসি সরমা!

সরমা আর কোনো উত্তর দিল না।

—তুমি যদি আমাকে ভালবাস তাহলে আমাকে বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে মিথ্যা বলিনি। গতকাল ভরত আমাকে বলছিল—বাবু, মায়ের কি কোনো মাথার অসুখ আছে ? বাজার দিতে গিয়ে দেখলাম আপন মনে কি যেন বলছেন, মাঝে মাঝেই দেখি—

এসব কথাতেও সরমা নিরুত্তর।

—তুমি এমন কোরোনা সরমা, এটা আরও হচ্ছে তুমি নিজেকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছো বলে, একা হয়ে থাকছো বলে। আমি ছাড়া তোমার আর কে আছে সরমা ? তেমনি তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে ?

মনে হলো সরমা ফুঁপিয়ে উঠল।

—তোমার সব ভার আমাকে দাও সরমা, দিয়ে একটু হালকা হও। আচ্ছা এমনও যদি হতো সত্যিই আমি সন্তান উৎপাদনে অক্ষম তাহলে তুমি কি করতে ? আমাকে কি ত্যাগ করতে ?

—না, না !—মৃদু আর্তনাদের মতো শোনালো সরমার কণ্ঠস্বর।

—একটু শান্ত হও—ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আমি বললাম—আমাদের পরস্পরকে আরও বেশী করে ভালবাসতে হবে যে সরমা নাহলে সমস্ত জীবন আমরা কাটাব কি করে ?

নিজের ওপর অযত্ন অবহেলায় সরমা দেখছি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। ওকে নিয়ে আজ প্রথম বেরোলাম। উত্তরের হাওয়ার কাল শুরু হয়েছে। এইসব স্থানে তার প্রকোপ একটু বেশীই মনে হয়। যদিও এখনও তেমন দাপটে শুরু হয়নি।

উঁচু নীচু প্রান্তরে একটু হাঁটতেই সরমা দেখি হাঁফিয়ে উঠেছে, বলল—এখানেই একটু বসি, —এই পাথরটায়।

দেখলাম সরমার কপালে, ঠোঁটের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম।

—বসো বসো,—আমি বললাম। বসতে গিয়ে ও যেন টলে যাচ্ছিল, আমি তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেললাম, বসিয়ে দিলাম।

—ভাবছিলাম ওই গাছটার তলায় গিয়ে বসব—মাঠের মাঝে একা দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাছকে দেখিয়ে আমি বললাম।

—এখানেই বসোনা—পাশের জায়গায় হাত দিয়ে দেখিয়ে সরমা বলল।

আমি দাঁড়িয়ে, সরমা বসে, মুখ তুলে তাকিয়ে ও কথা বলছিল, ওকে কেমন ক্লান্ত ও করুণ লাগছিল, ওর কণ্ঠস্বরও কি শান্ত, আমি পাশে বসলাম, ওর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে হাত বোলালাম। আমি যেন একটা শান্ত পাখীর গায়ে হাত বোলাচ্ছিলাম।

—ভাল করে খাওয়া দাওয়া করো, আর মনকে প্রফুল্ল রাখতে চেষ্টা করো। দেখতো কি সুন্দর পৃথিবী ! আর কি বিশুদ্ধ বাতাস ! —বলতে বলতে আমি দীর্ঘশ্বাস নিলাম—তোমার জন্য একটু দুধের ব্যবস্থা করতে হবে—

—আবার দুধ কেন ? —ছোট্ট মেয়ের মতো আবদারে গলায় বলল সরমা, —দুধ খেতে আমার ভাল লাগে না।

—অন্ততঃ কিছুদিন ভাল লাগাতেই হবে, কেমন ?

—আচ্ছা। সরমা বাধ্য বালিকার মতো ঘাড় নাড়ল।

—ভরত, রোজ একটু দুধের ব্যবস্থা করা যাবে ? ওর শরীরটা দুর্বল হয়ে গেছে—আমার সব চাহিদার যোগানদার ভরতকে বললাম।

—হ্যাঁ বাবু, সামনের গাঁয়ে বলে আসবখন, রোজ সকালে দিয়ে যাবে। আচ্ছা বাবু—মায়ের কি হয়েছে ? একটু ইতঃস্তত করে ভরত জিজ্ঞাসা করল।

কদিন ধরে ওকে কথাটা বলব বলব ভাবছিলাম, পাছে ও ভাবে সরমার মাথা খারাপ—এই ধারণাটা ওর বোধহয় হয়েই গেছে, এটা অন্তত মুছে দেওয়া দরকার। বললাম—আমাদের জীবনে একটা দুঃখ আছে ভরত, আমাদের ছেলেপুলে হয়নি। সেজন্যই ও চিন্তায় আর দুঃখে মাঝে মাঝে কেমন হয়ে যায়।

বলতে বলতে সরমা স্টেশন ঘরে হাজির।

বিকালের নরম রৌদ্র দূর পাহাড়ের মাথায় মাথায় সোনার মুকুট পরিয়েছে, এখানে ওখানে গাছের মাথায় তার ছোঁয়া, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মনটা খুব ভাল হয়ে গেল, সরমা বেড়াতে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েছে।

—আজকে ওই গাছটা পর্যন্ত ঠিক যাবো ! —সরমা সোৎসাহে বলল।

—নিশ্চয় যাবে—বললাম আমি।

—আচ্ছা ওই দূরে ওই যে পাহাড়টার মাথায় রোদ্দুর চিক্ চিক্ করছে—ওখানে একদিন বেড়াতে যাওয়া যায় না ?

—খুব যায়, তুমি ইচ্ছে করলেই যায়। ওদিকেই তো ভরতের গ্রাম।

—তাই নাকি ভরত ? সরমা বিস্ময় মাথা কণ্ঠে ভরতকে জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁ মা, আপনি যাবেন ?

—কিন্তু ও তো অনেক দূর, হেঁটে হেঁটে অতদূর যেতে কি পারবো ? আবার ফেরা! না ভরত পারবো না।

—হেঁটে যাবেন কেন ? আমি সামনের ওই ফুলডুংরি গাঁ থেকে গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা করে দেবো। সকাল সকাল বেরোলে ঘুরে বেড়িয়ে দিব্যি সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে আসতে পারবেন। ওই পাহাড়টার নাম হাতি পাহাড়—দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ভরত কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল—ওর নীচেই আমাদের গ্রাম।

—গ্রামে তোমার কে কে আছে ?

—বউ আছে, ছেলে আছে, বুড়ো বাবা আছে, আর আছে গাই, ছাগল, মুরগী—ওই পাহাড়ে একটা ঝরণা আছে। আর আছে বারো ঘর প্রতিবেশী।

—ঝরণাটা খুব সুন্দর ?

—খুব সুন্দর মা, ওই ঝরণার জল আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যায়, তার পাশে আমার ছোট ক্ষেত আছে, এখন সেখানে ছোলা হয়েছে। টিয়া পাখির ঝাঁক বড্ড জ্বালাতন করে, আমার বুড়ো বাবা সারাদিন লাঠি হাতে ক্ষেতের ধারে বসে পাখি তাড়ায়।

—তুমি কি সুন্দর দেশের কথা বলছ ভরত ! যেন রূপকথার জগৎ !

—সে নদীর কি সুন্দর আওয়াজ মা ! দিনরাত ঝুমঝুম বেজেই চলেছে। এতক্ষণে সব অন্ধকার হয়ে এল।

—কেন ? এখানে তো এখনও কত আলো !

—ওখানে যে চারপাশে পাহাড় ঘেরা মা—

...আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। একটি সামান্য শব্দও উচ্চারণ করিনি। ওরা যে অচিন দেশের গল্প করছে !

কদিন ধরে সরমার কি উৎসাহ ! সকালে ওঠা থেকে শুরু হয় বেড়াতে যাওয়ার কথা—শেষ হয় শুতে গিয়ে। সঙ্গে কি কি নিতে হবে—খাবার-দাবার, জলের ফ্লাস্ক। গোরুর গাড়ীতে একটা চাদর বিছিয়ে দেবো। হ্যাঁ ভরত, গাড়ীতে খড়-টড় দিয়ে গদি মতো করে দিতে বোলো। হ্যাঁ ভরত, তোমার ছেলে কত বড় ? হ্যাঁ গো, ওর ছেলের জন্য একটা কিছু নিতে হবে তো ?

মাসের প্রথমে বাড়ী যাওয়ার সময় সরমা কতবার যে ওকে মনে করিয়ে দিল—বাড়ীতে সব বুঝিয়ে আসার কথা !

ভরত কাছাকাছি গ্রাম থেকে গরুর গাড়ী ঠিক করে দেবে বলেছে, ও যেতে পারবে না, স্টেশনে ডিউটি দেবে কে ? তবে তার জন্য কোনো অসুবিধা হবে না, গাড়োয়ান চেনে ভরতের গ্রাম, ওখানে পৌঁছলে ওর বাড়ী যে কেউ দেখিয়ে দেবে। ছোট্ট তো গ্রাম, দশ-বারো ঘর পরিবার। ভরতের ছেলে ঝরণার পথ দেখিয়ে দেবে।

আর একটা অদ্ভুত কথা বলেছে ও, পাহাড়ের নির্জন বনে একজন সাধুমতো মানুষ আছেন, কি করে যে উনি ওখানে একা থাকেন কে জানে ! কিন্তু প্রয়োজন কেউ ওনার

কাছে গেলে গাছ-পাতার ওষুধ দেন। যদি মন চায় ওর সঙ্গে একবার দেখা করবেন, বলবেন আপনাদের কথা।

এ কথাটা আমি সরমাকে বলিনি। কি দরকার ভুলে থাকা আশাটাকে খুঁচিয়ে জাগানোর!

ভোর চারটে থেকে সরমার হুটোপাটি। ভাল করে সারারাত ঘুমোয়নি বোধহয়। যেন কোথায় কতদূরে বেড়াতে চলেছি আমরা।

পাঁচটা না বাজতে বাজতে গরুর গাড়ী এসে হাজির। চাদর পেতে বসে পড়া গেল। খড়ের গদি ভালই। ভরত এসেছে বিদায় জানাতে। যাত্রা শুরু হয়ে গেল।

—নাম কি তোমার ?—চালককে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

—হরি সিং।

—আমাদের জন্য তোমাকে কষ্ট করে ভোরবেলা উঠতে হলো !

—আমরা তো ভোরবেলাই উঠি বাবু। সন্ধে হতেই খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়া, কত আর ঘুমাব !

এই উঁচু-নীচু প্রান্তরের মাঝেও আছে প্রায় মসৃণ পথ। নীচু পথটা কোথায় লুকিয়ে ছিল ! আমরা যেন প্রান্তরে ডুবে গেলাম। সোনার রোদ্দুর আর উত্তুরে বাতাস উভয়েই আমাদের আদর জানাচ্ছিল।

প্রান্তর পেরিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম বৃক্ষদের রাজ্যে। গাছেরা কেমন শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে। বনভূমি আমরা কখনও দেখিনি। কি নিস্তব্ধ নিঝুম। গরুর গাড়ীর ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শুধু নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করছিল। কুচি কুচি রোদ্দুর এসে পড়ছিল গায়ে।

—এগুলো কি গাছ ? সরমা জিজ্ঞাসা করল।

—শালগাছ। হরি সিং বলল।

লালমাটির পথ বহুদূর পর্যন্ত সোজা দেখা যাচ্ছে এবং গাছের সারি, গাছেরা যেন পথকে আগলে রেখেছে।

হঠাৎ দেখি বনের মধ্যে কয়েকটি বাড়ী। মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। পরিস্কার নিকোনো দেয়ালে খড়ি দিয়ে আঁকা লতা-পাতা। কোনো কোনো বাড়ীর উঠোন দেখা যায়, সবকিছু কি পরিচ্ছন্ন ! গরু নিয়ে চলেছে এক বৃদ্ধ।

—কুথা যাবে হরি ?

—হাতিপাহাড়।

—অ ! কেনে ?

—বেড়াতে।

—বেড়াতে ? কৌতুহলী চোখে বৃদ্ধ আমাদের দেখছিল।

প্রকৃতি যেন আমাদের জন্য দৃশ্য সাজিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। জঙ্গল পেরিয়ে গ্রাম, একটু এগিয়ে কিছু গাছপালার ফাঁক দিয়ে রাস্তাটা কিছুটা নেমে গেছে, গরুর গাড়ি গড়গড়িয়ে নেমে গেল, আমাদের দুপাশে ধানক্ষেত।

গরুর গাড়ির গড়গড়ানিতে আমরা বেসামাল, সরমা খুব হাসছিল, সহসা ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে ও মুগ্ধ হয়ে চুপ করে গেল। প্রায় পাকা ধানের শীষগুলি ভারে নত।

—কি সুন্দর ! অস্ফুটে বলল সরমা।

ধানক্ষেত পেরিয়ে পুনরায় জঙ্গল। এবার আমাদের গাড়ী সামান্য চড়াইয়ে উঠছিল। দূরের পাহাড়গুলি এখন অনেক কাছে, ঘনবদ্ধ গাছপালা বেশ বোঝা যায়। আমার মধ্যে কেমন এক উত্তেজনা—ওই পাহাড়ে কি যেন রহস্য আছে, আমি কখনও পাহাড়ে যাইনি।

আমাদের পথের পাশ দিয়ে বহে চলেছিল শীর্ণ এক জলধারা, কোথাও পাথরের বাধায় ছিটকে উঠছিল জল, অদ্ভুত শব্দ উঠছিল।

—এই জল আসছে হাতিপাহাড়ের ঝরণা থেকে—বলল হরি সিং।

—আমরা যেখানে যাবো ?—সরমা জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁ।

আমার উত্তেজনা আমি লুকিয়ে রেখেছি কিন্তু সরমা চাপতে পারল না, চোখে মুখে তার প্রকাশ।

—কখন পৌঁছাব ?—সরমা অস্থির।

—এখনও অনেক দেরী, এক ঘন্টা লাগবে।

—এখনও এক ঘন্টা ?—সরমা হতাশ,—দেখেতো মনে হচ্ছে এইতো কাছে পাহাড়গুলো।

হরি হাসছিল—ওই পাহাড়গুলো কাছে নয় মা।

রোদ্দুরের তাপ বাড়ছিল, সরমার মুখ লালচে হয়ে উঠেছে। আনন্দ মানুষের মুখে কেমন স্বাস্থ্যের আভা ফোটায় ! সরমাকে নতুন করে দেখছিলাম আমি। বড় ভাল লাগছিল।

—কি দেখছ বলত ?—সরমা জিজ্ঞাসা করল।

আমি শুধু হাসলাম। সে হাসি মুগ্ধতার হাসি। সুখের হাসি। সরমা লজ্জা পেল, আরও সুন্দর দেখাল ওর মুখ।

পাহাড় যত কাছে আসছিল ততই বাড়ছিল বুকের মধ্যে উত্তেজনা। পাহাড়ের কাছে প্রথম আসবার উত্তেজনা আলাদা। অবশেষে আমরা পাহাড়ের পাদমূলে এসে পৌঁছলাম। নির্ঝরিণী এখানে কোন আড়াল থেকে নাচতে নাচতে চলে আসছে। হরি গাড়ি থামাল, নেমে পড়ল।

—কি হলো ?—আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—একটানা কতক্ষণ এলো, গরুগুলোকে একটু জিরোতে দিতে হবে, জল খাওয়াতে হবে, আপনারাও নামুন, একটু হাঁটাচলা করুন।

গরুর গাড়ীতে ওঠানামা বেশ কসরতের ব্যাপার। ওঠার চেয়ে নামা দেখি আরও কঠিন। আমি নামলাম যাহোক, সরমা ছোট্ট মেয়ের মতো আবদেরে—আমি কি করে

নামবো ? হরি ব্যস্ত গরু খুলতে, আমি সরমাকে কোলে করে নামিয়ে নিলাম। শরীরে বড় মধুর অনুভূতি জাগছিল।

রাস্তার ধারে একটা গাছের ছায়ায় গরু দুটিকে বাঁধল হরি। আমরা দুজনে জলধারার কাছে। জলে হাত ডুবিয়ে স্পর্শ নিলে সমস্ত জুড়ে শিহরণ। কী শীতল জল ! সরমা জল নিয়ে খেলা করতে লাগল।

যে গাছটিতে গরু বেঁধেছে হরি, তাকিয়ে দেখি সেটা তেঁতুল গাছ। অজস্র তেঁতুলে ছেয়ে আছে ডালপালা।

—দেখেছ সরমা, উপরের দিকে তাকাও—

সরমা তাকাল—তেঁতুল ! আমাকে দুটো পেড়ে দাওনা !

লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নীচু ডাল থেকে দু-একটা তেঁতুল পাড়া গেল।

গরুদের জল খাওয়াল হরি, নিজেও মুখে হাতে জল দিল।

ক্রমশঃ চড়াইয়ে উঠেছে পথ। পথের দু-পাশে বড় বড় পাথর আর তার ফাঁকে ফাঁকে বিশাল বিশাল গাছ। জলধারা দেখা যায় না, কিন্তু তার শব্দ বনভূমি সচকিত করছিল, যেন বলছিল আমি আছি, আমি আছি, আমি আছি। কতক্ষণ এভাবে চলতে চলতে পাহাড়ের গায়ে পাকদণ্ডী বেয়ে উঠছিল গাড়ী, গাছেদের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল ফেলে আসা প্রান্তর...

পাকদণ্ডী বেয়ে এবার বিপরীত দিকে নামার পালা, দেখলাম নীচে উপত্যকায় ছবির মতো ক্ষেত-খামার, ঘর-বাড়ী...

ওখানে পৌঁছানের জন্য কার তাড়া ? গরুদের নাকি গাড়ির, নাকি হরি সিং-এর! ঢালু পথ বেয়ে দ্রুত নেমে গেল গাড়ি। আসলে তাড়া আমাদেরই ! ওখানে পৌঁছানোর জন্য মন ছটফট করছিল।

এত পরিচ্ছন্ন হতে পারে মাটির উঠোন ? শুধু ঝাঁট দেওয়া নয়—নিকোনো। দাওয়ায় চাটাই না পাতলেও কিছু এসে যেত না, এমন পরিস্কার মাটির দাওয়া আমি কখনও দেখিনি।

পরিচ্ছন্ন বাড়ীর মতই পরিচ্ছন্ন ভরতের স্ত্রী। লালপাড় সাদা জমির মোটা শাড়ীপরা সুঠাম চেহারার শ্যামলা মেয়েটির মধ্যে অহেতুক জড়তা নেই। হাসি-হাসি মুখে এমন করে আমাদের বসতে দিলো যেন কতকালের চেনা, যদিও কথাবার্তায় খুবই সংক্ষিপ্ত।

মুড়ি, ছোলাভাজা আর গরুর দুধের ঘন চা খেয়ে আমরা ঝরণার সন্ধানে যাত্রা করলাম। পথপ্রদর্শক ভরতের কিশোর ছেলে লক্ষ্মণ।

যেদিকে তাকাই সেদিকেই পাহাড়। পাহাড়ের গা ঢেকে রেখেছে দীর্ঘদেহ বিশাল গাছেরা। সেই অরণ্যে আমরা প্রবেশ করলাম।

এখানে পথ কোথা ? বড় বড় পাথর থেকে পাথরে পা ফেলে উঠে যাওয়া, গাছের নীচু ডাল ধরে টাল সামলানো। লক্ষ্মণ কাঠবিড়ালীর মতো তরতরিয়ে উঠে যাচ্ছিল।

আমি অতটা দ্রুত না হলেও কিছুটা হয়ত পারলেও পারি, কিন্তু সরমার জন্য পারছিলাম না, বেচারী ধীরে ধীরে উঠছিল, হাঁফাচ্ছিল, আবার হাসছিলও। ওর মুখে রক্তের উচ্ছ্বাস, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে গলে পড়া রৌদ্রের চুমকি বাড়িয়ে দিচ্ছিল উজ্জ্বলতা, বড় ভাল লাগছিল ওকে।

জলধারা কোনদিক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কে জানে ! তার দেখা নেই কিন্তু শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

—একটু বসি। সরমা বলল।

বোসো—বসেই পড়লাম দু'জনে। একটু উঁচুতে লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে। ইশারায় ওকে বললাম, একটু বিশ্রাম নেব।

ঠিক আছে, বলে ও মুহূর্তে কোথায় হারিয়ে গেল, যেন পাখী ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল কোন গাছের ডালে।

আমরা দুজন চুপচাপ। শুধু গাছেদের শব্দ, ঝর্ণার শব্দ। আমার গায়ে হেলান দিয়ে বসল সরমা, দীর্ঘশ্বাস নিল।

—কষ্ট হচ্ছে ?

—না।

—তাহলে ?

—ভাল লাগছে।

কিন্তু লক্ষ্মণ কোথায় গেল ? চেঁচিয়ে ডাকলাম আমি। কিন্তু সাড়া নেই। কেমন ভয় ভয় লাগল, পথ না দেখালে এখান থেকে বেরোতে পারব না।

—ল—ক্ষ্ম—ণ ! আরও চিৎকার করে ডাকলাম আমি।

কিন্তু না, কোনো সাড়া নেই। পাথরে পাথরে পা দিয়ে দিয়ে কিছুটা উঠে গেলাম।

—দাঁড়াও, আমি যাবে—সরমা আর্তনাদ করে উঠল।

—ভয় পেয়োনা, আমি তোমাকে দেখছি—বললাম আমি, তবু সরমা দ্রুত উঠে আসতে চেষ্টা করছিল।

—আস্তে ওঠো, আস্তে, সাবধানে—

কিন্তু সরমা শুনল না, দ্রুত উঠে এলো, আমার হাত আঁকড়ে ধরল, কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—কি হবে ?

—ল-ক্ষ-ণ ! —প্রাণপণে চিৎকার করে ডাকলাম আমি, কিন্তু কোনো সাড়া নেই।

—চলো, ফিরে যাই—সরমা বলল,—আর ঝরণা দেখে কাজ নেই।

—কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে ফিরবো ?

—কেন ? এইতো সোজা পাথরের ওপর দিয়ে দিয়ে এলাম—বলতে বলতে সে নামতে থাকল। আমিও।

বেশ কিছুটা নেমে এলাম, কিন্তু এখানে পাথরগুলি কেমন ভিজে ভিজে, শ্যাওলা পিছল, এমন কোনো পথ দিয়েতো যাইনি। দুজনেই বুঝতে পারছিলাম অন্যদিকে চলে এসেছি। মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম, দুজনেরই বুক ধুক্‌পুক্ করছিল।

আরও কয়েক-পা পা-টিপে টিপে নামলাম এবং দেখলাম সামনে জলস্রোত পাথরে পাথরে উপছে উপছে ছুটে নেমে যাচ্ছে, একটু নেমেই আবার হারিয়ে গেছে পাথর ও গাছ-গাছালির ফাঁকে।

ভয়ে বুক গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। সরমা কাঁদছিল।

ল-ক্ষ-ণ ! —প্রাণপণে চিৎকার করলাম আমি। আমার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো। যেন আমাকে বিদ্রূপ করে উঠল। আমি পাগলের মতো চিৎকার করে চললাম—লক্ষণ...লক্ষণ...ল-ক্ষ-ণ...

—কে যেন নেমে আসছে—ফিস্‌ফিস্ করে বলল সরমা।

—কই কোথায় ?

—ওই যে পিছন দিকে—

আমি ফিরে তাকালাম।

তাঁর শরীর শীর্ণ, কিন্তু ঋজু, দুধের মতো সাদা চুলদাড়ি, সামান্য বসন কোমরে জড়ানো।

ভীত সরমা জোরে আঁকড়ে ধরল আমার বাহু।

—কে তোমরা ? কোমল গলায় বললেন তিনি।

আমরা যেন প্রাণ ফিরে পেলাম।

—বেড়াতে এসেছি আমরা, ঝরণা দেখব বলে পথ দেখিয়ে এনেছিল নীচের গ্রামের একটি ছেলে—লক্ষণ—কিন্তু হঠাৎ কোথায় যে চলে গেল !

—ও ! একটা ছেলেকে দেখলাম যেন। ঠিক আমাকে দেখেছে, আর ভয়ে পালিয়েছে।

—কেন ?—আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

—কোনো কারণ নেই—শান্ত হাসলেন তিনি, আসলে গ্রামের মেয়েরা বাচ্ছাদের ভয় দেখায়, 'দুষ্টুমি কলে পাহাড়ে ভয়বুড়োর কাছে দিয়ে আসবো।'—আমি নাকি ভয়বুড়ো।

এতক্ষণে আমার মনে পড়ে গেছে ভরতের কথা, আমি ভুলেই ছিলাম, বললাম—আমি কিন্তু এরকম শুনেছিলাম আপনি ওদের গাছ-গাছড়ার ওযুধ দেন।

—কখনও সখনও কেউ কেউ আসে বটে, সে তো ছেলেরা নয়। চলো আমি তোমাদের ঝরণার রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি—বলতে বলেত উনি এগিয়ে চললেন।

—তুমি কি করে জানলে ?—ফিস্ ফিস্ করে বলল সরমা।

—কি ?

—ওই যে ওনার কথা ?

—ভরত বলেছিল।

মোটামুটি সমতল মতো একটা জায়াগয় আমরা এসে দাঁড়ালাম, সামনে ছোটখাট গুহার মতো, গুহামুখে পাথর সাজিয়ে দেওয়ালের মতো করে পরিসর বাড়িয়ে নিয়ে বেশ ঘরের মতই হয়েছে।

—আমরা কিন্তু আপনার কাছেও এসেছি—সহসা বলে ফেললাম আমি।

উনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন—আমার কাছে ?

—হ্যাঁ, বিশেষ প্রয়োজনে।

—তোমরা তো শহরের মানুষ, আমি তোমাদের কি প্রয়োজনে লাগতে পারি ? কেইবা এখানে পাঠিয়েছে ? তোমাদের চেঁচামেচি শুনে আমি নেমে গিয়েছিলাম, ভাবছিলাম হয়ত কেউ কোনো বিপদে পড়েছে।

—আপনার এখানে আমাদের একটু বসতে দেবেন না ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, এসো এসো,—বলতে বলতে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন, আমরা জুতো খুলে ভিতরে, পা বেয়ে কেমন এক শিরহণ। সরমার আঁকড়ে ধরা হাত আমাকে ছাড়েনি, ওরও শিহরিত শরীর...

প্রবেশ মুখের চেয়ে ভিতরটা বেশ প্রশস্ত। বাইরের উজ্জ্বল রোদ্দুরের আভায় ভিতরে সবকিছুই মোটামুটি দৃশ্যমান। মেঝেতে একদিকে শুকনো পাতা গদির মতো করে তার ওপর পাতা কম্বল, আরেকটি কম্বল ভাঁজ করে রাখা। আর একটি মোটামুটি সমতল প্রস্তরখণ্ড তাকের মতো, তার ওপর খান তিন-চার বই, আর কয়েকটি টুকিটাকি জিনিস, কি ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, আমাদের সামনে মেঝেতে একটা মাটির মালসা, তাতে মনে হচ্ছে টুকরো করে কাটা কয়েকটি ডুমুর ও মুঠোখানেক চাল।

সামান্য জিনিসকটি দেখতে কয়েক মুর্হূতমাত্র লাগল, দেখতে দেখতেই মেঝেতে বসে পড়লাম আমরা, ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, আরামবোধ করলাম।

—আমি ভাত ফোটানোর জোগাড় করছিলাম, এমন সময় শুনলাম—বলতে বলতে উনি মালসাটা সরিয়ে দেওয়ালের দিকে রাখলেন।

—এইগুলি একসঙ্গে সিদ্ধ—আমি সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম।

—এই ডুমুরগুলি খুবই সুস্বাদু, একসঙ্গে ফুটিয়ে একটু নুন দিয়ে মেখে নিই—

—এভাবে রোজ খাওয়া—

হাসলেন উনি,—এই জঙ্গলে অনেক খাদ্য, আমি একা আর কতটুকু খেতে পারি। তাছাড়া এই প্রাণটুকু ধরে রাখতে কতটুকু খাদ্যই বা প্রয়োজন !

—এই জঙ্গলে অনেক খাদ্য ?

—অনেক, অনেক। ডুমুর, কন্দ, আলু, কলা, পেঁপে, কত টক মিষ্টি কুল, কত জাম, আম গাছও আছে বকুল, কিন্তু তার চেয়েও মূল্যবান—এই পাহাড়ে আছে অনেক

জীবনদায়ী গাছ,—আমি সেগুলিকে যত্ন করি। মাঝে মাঝে গ্রাম থেকে কেউ এলে দিয়ে যায় কিছু চাল, ডাল, ছোলা—

—এভাবে একা থাকা—এমন খাওয়া—

—একা কোথায় ? পাহাড়ে তো ভীড়ে ভীড়।

—ভীড় ?

—নয় ? হাজার হাজার গাছপালা ভীড় করে আছে।

—এরা আপনার সঙ্গী ?

—তাইতো।

—আর খাওয়া ?

—খাওয়াতো বেঁচে থাকার জন্য ! কিন্তু তোমরা ঝরণা দেখতে যাবেত ?

—ও হ্যাঁ, ভুলেই গেছি। কিন্তু কি আশ্চর্য মানুষ আপনি !

হাসলেন উনি, বললেন—কি যে বলো ! নাও ওঠো—

—কিন্তু আমাদের কথাতো বলা হয়নি।

—কি কথা ? বলো তাহলে।

কিন্তু বলবো বললেই কি আর বলা যায় ! আমি সরমার মুখের দিকে চাইলাম। সরমা মুখ নীচু করে নিলো।

—আমরা নিঃসন্তান। পাঁচ বছর হয়ে গেল আমাদের বিয়ে হয়েছে কিন্তু সন্তান হওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। ডাক্তার দেখেছেন, সব রকম পরীক্ষা হয়েছে, বলেছেন দুজনেরই কোন দোষ নেই, তবু—বললাম আমি।

মাথা ঝুঁকিয়ে চুপ করে বসে রইলেন উনি। তিনজনই চুপচাপ। অরণ্যের আশ্চর্য শব্দ শুধু ভাসছিল বাতাসে, মনে হচ্ছিল কারা যেন কথা বলছে মৃদুস্বরে।

—পঞ্চভূত কাকে বলে জানো ? সহসা প্রশ্ন করলেন উনি।

—জানি। আমি বললাম—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

—অর্থ জানো ? জান কি পঞ্চভূত কেন বলা হয় ?

—ঠিক ঠিক বোধহয় জানি না।

—মাটি, জল, তাপ, বাতাস, ও শূন্য এই পঞ্চভূত। ভূত শব্দের অর্থ আদি, অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা-কিছু সৃষ্টি তার আদি বা মূল উপাদান হচ্ছে ওই পাঁচটি, ওর বাইরে কিছু নেই। ওই পঞ্চভূত থেকেই সৃষ্টি হয় মানব দেহ, মৃত্যুর পর আবার মিলিয়ে যায় পঞ্চভূতে।

এসব কথা উনি কেন বলছেন আমি বুঝতে পারলাম না, অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

—পনেরো-ষোল বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেছি—আত্মগতভাবে বললেন উনি—জীব সৃষ্টির রহস্য কিছুই জানি না, তবে শাস্ত্র পড়ে এটুকু শিখেছি। গীতায় পড়েছি ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের বাণী। বলেছেন বসন জীর্ণ হলে যেমন মানুষ তা পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে তেমনি শরীর জীর্ণ হলে আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নবীন শরীরে প্রবেশ করে। আত্মা অমর।

সরমা আমায় আঁকড়ে ছিলই, সহসা কেঁপে উঠল।

—কি হলো ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—কি জানি, কেমন যেন মনে হলো।

—ভয় পেলে কি মা ?

—না, ভয় না। লজ্জিত গলায় বলল সরমা।

—মা, জীব সৃষ্টি হচ্ছে পরমেশ্বরের ইচ্ছায়, জীবাত্মা সেই পরমাত্মারই জ্যোতি, তিনি যখন ইচ্ছা করবেন তখনই তোমার মধ্যে প্রবেশে করবেন, তাই হতাশ হবার কিছু নেই।

কিন্তু হতাশ হলাম।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল সরমা। অর্থাৎ আশাভঙ্গ।

—এসব গূঢ়তত্ত্ব জেনেই বা কি লাভ আমার ! উঠতে উঠতে বললাম আমি—পৃথিবীতে রোজ লক্ষ লক্ষ শিশু জন্ম নিচ্ছে, আত্মার প্রবেশ ও প্রস্থানের গল্প না জেনেই। নাও ওঠো সরমা।

আমার কথাগুলি একটু বিদ্রূপাত্মক হয়ে গিয়েছিল বোধহয়, উনি বললেন—অবিশ্বাস কোরো না, গীতাকে অবিশ্বাস কোরো না, বরং ফিরে একখণ্ড গীতা কিনে এনো, সংস্কৃত বোঝবার দরকার নেই, বাংলায় ব্যাখ্যা করা অনেকের লেখা গীতা পাওয়া যায়, তাই সংগ্রহ কোরো, জীবনের অর্থ খুঁজে পাবে, খুঁজে পাবে পথের দিশা। চলো, তোমাদের ঝর্ণার পথ দেখিয়ে দিই।

আমরা তিনজনে গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম।

—জঙ্গলে পথ চলতে গেলে নিশানা রেখে রেখে চলতে হয়, উনি বললেন। খড়িমাটির মতো একটি পাথরের খণ্ড আমার হাতে দিলেন, বললেন—কিছুদূর অন্তর পথের পাশে পাথরের গায়ে দাগ দিয়ে চলো।

পথ কোথায় ? পাথরে পাথরে পা ফেলে গাছেদের ভীড় ঠেলে এগিয়ে চলা, মাঝে মাঝে দাগ দিয়ে দিচ্ছিলাম। চড়াই ভেঙে উঠতে বেশ কষ্ট, সরমার কষ্ট আরও বেশী।

মনে হচ্ছে, না এলেই ভাল হতো। তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে সরমা, বললাম আমি।

—না, না, তেমন কিছু নয়। হাঁফাতে হাঁফাতে সরমা বলল।

—আর একটু কষ্ট, একথা নিশ্চিত বলতে পারি ঝর্ণার কাছে পৌঁছলে সব কষ্ট ভুলে যাবে। —আমাদের আগে আগে অনায়াসে উঠে যেতে যেতে বললেন উনি—ঠিক আছে, একটু বসে নাও, এখানের বাতাস বড় নির্মল, একটু বিশ্রামেই সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।

বসলাম, সরমাও বসল, উনি একটু উঁচুতে একটা পাথরে বসলেন।

—তখন কি বলতে কি বলে ফেলেছি, আপনাকে আমি আঘাত করতে চাইনি, আমাকে ক্ষমা করবেন, বললাম আমি।

—আরে না না, আমি কিছু মনে করিনি, তবে আমি যা বললাম তা করতে চেষ্টা কোরো।

—আপনি যোগী মানুষ, সাধনার জন্য এই নির্জনে বনবাস গ্রহণ করেছেন, আমরা সাধারণ মানুষ, আপনাকে দর্শন করাও পুণ্যের। সেই পুণ্যেই আমাদের মনোবাসনা নিশ্চয় পূর্ণ হবে।

—এভাবে বোলো না, ঈশ্বরের কাছে একান্ত মনে প্রার্থনা করো, তিনি তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করবেন।

—জীর্ণদেহ ছেড়ে আত্মা কিভাবে আমার শরীরে প্রবেশ করে নতুন দেহ ধারণ করবে ? সরমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল।

—ওই কথাটা নিয়ে তুমি খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছ মনে হচ্ছে ? মুশকিল হলো তো! বেদান্ত দর্শনে এর ব্যাখ্যা আছে, সে অনেক জটিল কথা, সহজ কথায় তোমাদের বলতে পারি—মৃত্যুর পর আত্মা বায়বীয় অবস্থায় কিছুকাল অতিবাহিত করে পরে জলরূপে শস্য, ফল ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জীবদেহে প্রবেশ করে। সবই হয় ওই পঞ্চভূতের মাধ্যমে, তার বাইরে কিছু নেই। আহার্য থেকেই শরীরে অস্থি, মজ্জা, মেদ, রক্ত, শুক্র সবকিছু তৈরী হয়, এভাবেই শুক্রের মধ্য দিয়েই তার প্রবেশ।

এই ব্যাপার ! আমি ভাবছিলাম কি না কি !—আমি বলে ফেললাম।

উনি হেসে উঠলেন। বললেন—ওঠো, এবার নিশ্চয় যেতে পারবে।

পুনরায় যাত্রা শুরু হলো। বাতাসে দূরাগত বৃষ্টিধারার শব্দের মতো একটা শব্দ ভাসছিল, আমরা যতই উঠছিলাম সেই শব্দ ততই বেড়ে উঠছিল, এভাবে একসময় চড়াই শেষ, মোটামুটি সমতল ভূমির এক অরণ্যে আমরা পৌঁছলাম। এখানে অরণ্য আরও নিবিড়।

—কি করে রাস্তা চিনছেন আপনি ? আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

—আমি যে বনবাসী ! তিনি বললেন—এই বনের প্রতিটি গাছকে আমি চিনি প্রতিটি গাছ আমাকে চেনে।

এবার আমরা পেয়ে গেলাম ঝরণার চলার পথ, জলধারা ধয়ে চলেছে পাথরে পাথরে, পাথরগুলি মসৃণ হয়ে ছোট বড় নুড়ির আকার ধারণ করেছে। বাতাসে তীব্র গর্জনের শব্দ বুঝিয়ে দিচ্ছিল আমরা তার কাছে এসে গেছি।

—আচ্ছা, আপনি যে বললেন যোল বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেছেন, সেই থেকেই কি এখানে ? জোরে জোরে কথা বলতে হচ্ছিল, জলের শব্দ ছাপিয়ে।

—আরে না না, ছোটবেলা থেকেই আমার মন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে চাইত, একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে চলে গিয়েছিলাম হিমালয়ে, সেখানে কত তীর্থ কত আশ্রম ঘুরেছি, এখানে আছি বছর দশেক। ঠিক হিসাব তো নেই তবে ঋতু পরিবর্তনে বৎসরের হিসাব পাই।

—তবু কত বয়স হলো আপনার ?

—ঠিক বলতে পারব না, তবে নব্বইয়ের কাছাকাছি হবে।

উনি আগে, সরমাকে মাঝে রেখে আমি পিছনে চলছিলাম, ওনার হাঁটার ভঙ্গী দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম, নব্বই বছরের বৃদ্ধ বালকের মতো হাঁটছেন।

—জীবনের বাকি দিনগুলি এখানেই কাটিয়ে দেব ঠিক করেছি। উনি বললেন।

—যাহোক কিছু ওষুধ আমাদের দিন না, আপনি পুণ্যবান মানুষ, ঘাস ছিঁড়ে দিলেও তাতেই কাজ হবে।

হা হা করে হেসে উঠলেন তিনি। ঝরণার জলের শব্দ বড়ই তীব্র—সেই শব্দের সঙ্গে হাসি মিলে মিশে এক নতুন প্রাণময় শব্দের সৃষ্টি হলো, বললেন—ঘাসকে অত ফেলনা মনে কোরো না, ঘাসের রসে অনেক গুণ।

একটা বাঁকের মুখে এসে পৌঁছলাম আমরা, জলধারা আরও বেগবতী। উনি বাঁকের ওদিকে—বললেন, এসে গেছি।

আমরা বাঁক ঘুরলাম আর স্তম্ভিত হয়ে গেলাম ! অদূরে কলকল্লোলে ঝরে পড়ছে শুভ্র জলস্রোত, চারপাশে বেশ কিছুটা স্থান উন্মুক্ত, জলধারা বহে চলেছে, দুপাশে অজস্র রঙ-বেরঙের ছোট বড় নুড়ি, তার দুপাশে সোনালী বালুকাময় ভূমি, চারপাশে গভীর সবুজ স্থির বনভূমির মাঝে এক চঞ্চল উচ্ছল প্রাণ। সত্যিই ওকে জীবন্ত মনে হচ্ছিল।

—বড় পবিত্র এই স্থান—ঝরণার দিকে তাকিয়ে আত্মগতভাবে বললেন তিনি—কত দিন কত রাত আমি এখানে কাটিয়েছি ! পূর্ণিমা রাতে মনে হয় এখানে নেমে এসেছে স্বর্গ ! মনে হয় ঈশ্বর স্বয়ং জলখেলা খেলতে নেমেছেন।

—পূর্ণিমা রাতে কেন, এখনই মনে হচ্ছে এখানেই স্বর্গ—সরমা বলল, ওকে এত আনন্দিত লাগছিল ! সমতল বালুকাময় ভূমির ওপর দিয়ে ও ছুটতে শুরু করল।

—অমন করে ছুটো না, কোথাও পাথরে হোঁচট খাবে—চিৎকার করে বললাম আমি।

—ওর আনন্দে বাধা দিও না,—উনি বললেন, মায়ের আমার বড় মনঃকষ্ট।

একটু চুপচাপ উনি কি ভাবলেন, তারপর বললেন—এক কাজ কর, ওই যে ডানদিকে ওখানে একটা বিরাট গেরুয়া রঙের সমতল পাথর দেখতে পাচ্ছ ওখানে একটা গাছ আছে দেখবে, খুব বড় গাছ নয়। ওই গাছে হলদে রঙের ছোট ছোট কুলের মতো ফল ধরে আছে দেখবে, দুজনে কয়েকটা ফল খাবে, খুবই সুস্বাদু ফল, তারপর স্নান করো। জলস্রোতে নামবে না আঘাত পাবে, জলের ধারে পাথরের ওপর বসে স্নান করো, স্নান

শেষে দুজনে পাশাপাশি বসে ঈশ্বরের কাছে একান্ত মনে প্রার্থনা করো। ঈশ্বর তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করুন।

—এভাবে বলছেন কেন ? আমরা তো আপনার সঙ্গেই ফিরব ?

—না, আমি এখনই ফিরে যাবো, আহার্য প্রস্তুত করতে হবে, দ্বিপ্রহর পেরিয়ে গেলে আমার আর আহার করা হবে না।

—ভয় লাগছে, যদি ফিরতে না পারি ?

—ভয় নেই, চিহ্ন দেখে দেখে ফিরবে আমার গুহায়, আর হারিয়ে গেলে আমি ঠিক তোমাদের খুঁজে নেবো।

—এই পবিত্রভূমি জনমানব শূন্য,—বলতে বলতে ফিরলেন উনি, চলে যেতে যেতে বললেন—মনে রাখবে ঈশ্বরের কাছে দাঁড়াতে হয় শিশুর মতো। দ্রুতপদে কোথায় হারিয়ে গেলেন।

আমি ছুটতে ছুটতে সরমার কাছে গেলাম, ও মন্ত্রমুগ্ধের মতো জলপ্রপাতের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি ওর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম, ওর কাঁধে দুহাত রাখলাম।

—ও কি !—সরমা সরে গেল—ওনার সামনে—

—উনি চলে গেছেন—

—চলে গেছেন ? সে কি ? আমরা ফিরবো কি করে ?

—চিহ্ন দেখে ওনার গুহায় ফিরতে বলেছেন, ওখানে থেকে বোধহয় উনি আমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন।

—তোমার ভয় লাগছে না ? আমার কিন্তু ভয় করছে।

—ভয় নেই, উনি বলেছেন হারিয়ে গেলে উনি আমাদের ঠিক খুঁজে নেবেন।

—যাক্‌গে যা হবার হবে—চটি খুলে রেখে জলের ধারে একটা পাথরে বসে পড়ল সরমা, পা ডুবিয়ে দিল জলে।

—আহ্ ! পা দুটো যেন জুড়িয়ে গেল ! মনে হচ্ছে খুব করে স্নান করি।

অমি সরমার পাশে বসলাম, বললাম—হ্যাঁ স্নান করতে হবে।

—এখানে ক'দিন যদি থাকা যেত !—সরমা স্বপ্নের ঘোরে।

—পূর্ণিমা রাতে চাঁদের আলোয় স্নান করা যেত !—আমি ওর স্বপ্নে রূপোলী পাড় বসালাম। ওহো, তোমাকে একটা জিনিস খাওয়াবো, খুব নাকি ভাল খেতে।

আমি উঠলাম, পায়ে পায়ে সেই গেরুয়া রঙের সমতল পাথরের কাছে পৌঁছলাম, একটা গাছ রয়েছে দেখছি হলদে রঙের ছোট ছোট কয়েকটা ফল ধরে আছে।

আমাকে অনুসরণ করে সরমা কাছে এসে দাঁড়াল, বলল—কি খাওয়াবে ?

—এই ফল, উনি বলে গেছেন খেতে, খুব নাকি সুস্বাদু।

—হোকগে সুস্বাদু, ও আমি খাবো না, কি একটা অচেনা বুনো ফল, খেয়ে কি বলতে কি হবে !—সরমা বলল।

—কিন্তু উনি যে বলেছেন, এই ফল খেয়ে তারপর স্নান করতে, স্নান করে দুজনে পাশাপাশি বসে ভগবানের কাছে একান্ত মনে প্রার্থনা করতে বলেছেন।

—তাই নাকি ?—সরমা চিন্তিত।

—ওই যে আমি বলেছিলাম না—আপনি যাহোক একটা ওষুধ দিন—

—দাও তাহলে !—সরমা হাত পাতল।

ডাল নুইয়ে কয়েকটা ফল ছিঁড়লাম আমি, সরমার হাতে দিতে গিয়েও থামলাম, বললাম—দাঁড়াও, আগে আমি খেয়ে দেখি।

সামান্য একটু অংশ দাঁত দিয়ে কেটে নিলাম আমি, স্বাদ নিলাম—টক মিষ্টি মেশা কুলের মতো—ফলটা খেয়েই নিলাম,—একটা ঝাঁঝালো ভাব মুখের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

—কি ? কেমন ?—সরমা কৌতূহলী।

—ভালই,—আরেকটা মুখে পুরে বললাম আমি, সরমার হাতে কয়েকটা দিলাম।

ঝাঁঝালো ভাব মুখের মধ্য দিয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল, ততক্ষণে কয়েকটা খাওয়া হয়ে গেছে—সরমা, কটা খেলে ?

—চারটে দিয়েছিল, চারটেই খাওয়া হয়ে গেছে, কি ঝাঁঝালো ! তাই না ?

কানের মধ্যে ঝম্‌ঝম্ করছিল, জলের শব্দ, সরমার কথা সবকিছু কেমন খন্‌খনে—

—কেমন যেন হচ্ছে—সরমা বলল—কেমন গরম লাগছে আমার।

—আমারও।

—কি হবে ? কেন খেলাম ?

দুজনে পাথরের ওপর বসে পড়লাম। জামা খুলে ফেললাম আমি, গেঞ্জিও বড় গরম।

—আমার জামাটাও খুলে দাও, থাকতে পারছি না,—সরমা বলল, উপুড় হয়ে পড়ল আমার কোলের ওপর।

একটা মদির ভাব ছড়িয়ে পড়ছিল শরীরে, সরমা আমাকে আঁকড়ে বুকে মুখ ঘসছিল...

বিশ্বচরাচর কি বিলুপ্ত হয়েছিল জলপ্লাবনে ? শুধু জেগেছিল ওই গৈরিক শিলা আর সেই শিলাশয্যায় ক্রীড়ারত দুই নারী ও পুরুষ...দুই নয় এক দেহ...

কতক্ষণ পর আমরা আবার দুই হলাম, পরস্পরকে দেখলাম...নগ্ন দেহ...

থেমেছে উন্মাদনা কিন্তু কি উত্তাপ শরীর জুড়ে, আমি উঠে দাঁড়ালাম, শরীর যেন নিজের নয়, তবু সরমাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম, জল খিলখিল হেসে আমাদের ডাকছিল।

পরস্পরকে অবলম্বন করে আমরা টলতে টলতে হেঁটে গেলাম জলের ধারে, সরমাকে বসালাম, পাশে বসে দু'হাত ভরে জল নিয়ে সরমার গায়ে মাথায় ঢেলে দিতে লাগলাম।

পাগলের মতো আমরা পরস্পরকে জলসিক্ত করছিলাম।

এভাবে শরীর ক্রমশঃ শান্ত সুস্থির...

লজ্জিত সরমা দু-হাতে বুক ঢেকে হাঁটুতে মুখ গুঁজে নিজেকে আড়াল করতে চাইল। আমি হা হা করে হেসে উঠলাম, বললাম—যাদুকর, ওই যাদুকর আমাদের নিয়ে বড় খেলেছে !

—আমাকে কাপড় এনে দাও—হাঁটুতে মুখ গুঁজে রেখে ওভাবেই বলল সরমা।

—আমাদের এখন প্রার্থনা করতে হবে সরমা—বললাম আমি—এভাবেই উনি বলেছিলেন ঈশ্বরের কাছে দাঁড়াতে হয় শিশুর মতো...সরমা, সঙ্কোচ ত্যাগ করো।

আমরা নতজানু হয়ে বসলাম, পাশাপাশি, জলপ্রপাতের দিকে চেয়ে। সরমার ঠোঁট কাঁপছিল, দু'চোখের কোলে অশ্রুবিন্দু।

অবাঞ্ছিতা

মহামান্য বিচারপতি, আপনাকে আমার কিছু বলার আছে, দয়া করে আমার জন্য একটু সময় দিন। মুখোমুখি সব কথা বলতে পারব না, তাই লিখে জানানোই ভাল মনে করলাম। তাছাড়া আমি সাত দিন ধরে আপনার সঙ্গে দেখা করার আশায় ঘুরেছি, কিন্তু দেখা করা সম্ভব হয়নি। আসলে তখন কিছু না ভেবেই দেখা করার জন্য ব্যগ্র হয়ে ঘুরছিলাম। সাত দিন আগে যেদিন খবরের কাগজে আপনার ছবি দেখেছিলাম—কিংবা ছবিটা এমনিই দেখতে দেখতে ছবির পাশের কলমে সংবাদটুকু পড়ছিলাম—সেই কয়েকটি মাত্র লাইন পড়তে পড়তে আমার চোখের সামনে অন্ধকার...সেই সকালবেলা—যখন উজ্জ্বল রৌদ্রে ধুয়ে যাচ্ছে পৃথিবী...

ছবিতে আপনি ও আপনার স্ত্রী—আপনার ক্রোড়ে শিশুটি—কি অপরূপ ! স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঝলমলে শিশুটি ছবি আলো করেছিল। আমি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। দেখতে দেখতে আমার বুকের মধ্যে কেমন এক যন্ত্রণা আমাকে অস্থির করছিল।

হঠাৎই মনে হলো খবরের কাগজটা লুকিয়ে ফেলা দরকার। যদি আমার স্ত্রীর চোখে পড়ে ? পাশের ঘরে আমার স্ত্রীর উপস্থিতি—তার মৃদু কণ্ঠস্বর আমাকে চিন্তিত করছিল। সে শিশু পুত্রটিকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করছিল। শিশুটি প্রায় সারারাত ঘুমায়নি। তার হাঁফটান। জন্মের মাত্র কয়েকদিন পর থেকেই তার এই অসুখের উপসর্গ—চিকিৎসা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন মাত্র ভাল থাকা, পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়া—এভাবেই চলছে দেড় বছর। হ্যাঁ—দীর্ঘ দেড় বছর...কি যন্ত্রণাময়...কাল রাতে একই ভাবে পুনরাবৃত্তি—সকাল হতেই আমি ডাক্তারের কাছে ছুটেছিলাম এবং ওষুধ কিনে নিয়ে তবে বাড়ী ঢুকেছি। সেই ওষুধ খাইয়ে স্ত্রী ওকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করছিল। ক্লান্ত আমি এঘরে এসে আধশোয়া। সকাল থেকে এককাপ চাও তৈরী করা হয়ে ওঠেনি। এক গ্লাস জল খেয়ে কাগজটা নিয়ে বসেছিলাম...। অতঃপর কাগজটা কোথায় লুকিয়ে রাখি ভাবতে ভাবতে পুরোনো কাগজের স্তূপে একেবারে নীচের দিকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।

কোথা থেকে যে শুরু করব বুঝতে পারছি না। কেনই বা আপনাকে লিখছি নিজেই ঠিক জানিনা। যদিও একথা জানি আপনার কাছে দেওয়া এই স্বীকারোক্তি আমার বিরুদ্ধেই যাবে, হয়তো আমাকে ও আমার স্ত্রীকে দণ্ড পেতে হবে—তবু লিখছি কারণ এই দীর্ঘ দেড় বছর ধরে আমরা প্রতি মুহূর্তে যে দণ্ড ভোগ করছি...সেই দণ্ড চরম মনে হলো যখন ছবিটা দেখলাম...।

বিবাহের পর পাঁচ বছরেও যখন আমাদের কোন সন্তান হল না আমরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমি ও আমার স্ত্রী শহরতলীর একটা বাসায় ভাড়া থাকি, আমাদের বাড়ী বর্ধমানে, সেখানেই সকলে থাকেন। মাঝে মাঝে বাড়ীতে গেলে স্ত্রীকে মায়ের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো। মা হয়তো ভাবতেন আমরা নিজেরাই এখন সন্তান চাইছি না, তাই সে ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েই কথা বলতেন, দেরী করতে নিষেধ করতেন।

আমার মায়ের খুব সাধ পুত্র-সন্তানের, নাতির মুখ দেখাটাই তাঁর জীবনের শেষ সাধ...এই পৃথিবীতে তাঁর আর কিছু চাওয়ার নেই।

অবশেষে আমরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে গেলাম। প্রায় বছর খানেক চিকিৎসার পর আমরা সুফল পেলাম। আমার স্ত্রীর কিছু অসুবিধা ছিল।

মাকে সুসংবাদ জানিয়ে চিঠি দিলাম। মা তাঁর মানত করা সকল দেবতাকে পুজো দিয়ে আশীর্বাদ পাঠালেন।

স্ত্রীর কথা ঃ

কদিন ধরে ওকে আমি খুব চিন্তিত দেখছি। অস্থিরও বটে। উঠতে বসতে খেতে ঘুমোতে কিছুতেই যেন স্বস্তি নেই। অফিস যাওয়া আসাও অনিয়মিত। দুদিন যদি বা অফিস বেরনোর সময় বেরল—ফিরল দুপুরে, আবার দুদিন অনেক দেরীতে বেরল—প্রায় বারোটা, ফিরল যথা সময়েই। এমনকি যে মানুষটা এমন টি.ভি. পাগল, অফিস থেকে আসতে না আসতেই টি.ভি.-র সামনে—সে ওই ধারেই যাচ্ছে না। বরং কাল সন্ধ্যাবেলা দেখি কি যেন লিখছে। মনে হলো আমাকে দেখেই বোধহয় এ্যাটাচিতে ঢুকিয়ে রাখল। আমার কৌতূহল খুবই বেড়ে গেল, সকালে ও যখন স্নান করতে ঢুকল তখনই আমি এ্যাটাচি খুলে দেখতে চাইলাম কি লিখছিল। পড়লাম—মহামান্য বিচারপতি....

লেখাটা আমার কাছে খুব রহস্যময় লাগল। আমাদের দুজনকেই দণ্ড পেতে হবে—পড়তে পড়তে আমার বুক ধড়ফড় করছিল। তাহলে কি ওই সংক্রান্ত খবর কিছু কাগজে বেরিয়েছে ? আবার লিখেছে—দীর্ঘ দেড় বছর ধরে আমরা প্রতিমুহূর্তে যে দণ্ড ভোগ করছি....হ্যাঁ এই অসুস্থ শিশুটিকে নিয়ে আমরা—কিন্তু কাগজে কি বেরিয়েছিল? কাগজটা গুঁজে রেখেছে পুরোনো কাগজের থাকের একেবারে নীচে।

লেখাটা এ্যাটাচিতে রাখলাম। কাগজটা দেখার জন্য মন অস্থির হয়ে উঠল।

ও অফিস বেরিয়ে গেলে আমি খবরের কাগজের থাকের নীচ থেকে কাগজটি বার করলাম, খুঁজে পেতে চেষ্টা করলাম—ছবি শিশু ক্রোড়ে বিচরপতি ও তাঁর স্ত্রী—

ছবি পেলাম, খবর পড়লাম, তারপর—

তারপর কি হচ্ছে আমি কি করে বোঝাই ? দুঃখে না সুখে আমার বুক ফেটে যাবে!

আমরা চার বোন। আমাদের কোনো ভাই নেই। আমি আবার ছোট মেয়ে। সংসারে সকলের অবহেলা সইতে সইতে আমিতো এটা বুঝেছিলাম আমার জন্মানোটাই অন্যায় হয়েছে। সেই অন্যায় বোধ বুকে নিয়ে আমি চিরকালের ভীতু। সব সময় নিজেকে কোন কোটরে ঢুকিয়ে রাখতে পারলে বেঁচে যেতাম।

...এভাবেই বড় হয়ে গেলাম...স্কুলের গণ্ডীও পেরিয়ে গেলাম...তারপর একদিন বিয়েও হয়ে গেল। দিদি জামাইবাবুদের বদান্যতায় আর বাবার শেষ সম্বলের খানিকটা ভেঙে সব মিলিয়ে কোনরকম ব্যবস্থা হয়ে গেল। যদিও তার সঙ্গে ছিল অবাঞ্ছিতার

প্রতি প্রচুর করুণামিশ্রিত কথার বোঝা—সকলে মিলে যে দয়া করে আমায় উদ্ধার করলেন !

আমি এক অন্য জীবনে প্রবেশ করলাম...স্বামী পেলাম, ভালবাসা পেলাম, সংসার পেলাম,—একান্ত নিজের সব, সব, স-ব ! এত পাওয়া আমার জন্য সঞ্চিত ছিল ! আমিও নিজেকে বুঝি উৎসর্গ করলাম। সারক্ষণ শুধু একটি মাত্র মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ !

বছরের পর বছর যায়, আবার বুঝি ফিরে আসে সেই কোটরে লুকিয়ে থাকার দিন। পাঁচ বছর হয়ে গেল সন্তান কই ? আমার শাশুড়ি নাতির মুখ দেখে মরতে চান—তাঁর সাধ ! তাঁর চেয়েও বড় আমার স্বামীর পিতা হওয়ার সাধ, বংশ রক্ষার সাধ...আমার সাধের কথা না হয় থাক।

ডাক্তারবাবু দুজনকে পরীক্ষা করে রায় দিলেন আমারহ ত্রুটি। আমার স্বামী আমাকে সত্যিই ভালবাসে, কথাটা বাড়ীতে জানাল না, কাউকেই জানাল না, চিকিৎসার ব্যবস্থা করল।

অবশেষে সুদিন এলো। আমার শরীরের মধ্যে আরেকটি প্রাণের অনুপ্রবেশ...ও আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু নিজের বিশ্রামের জন্য আমি ওকে ফেলে একা চলে যাব ? তাও কি সম্ভব ? এখন ওর সব কিছুই যে আমি নির্ভর! তাছাড়া ওকে ছেড়ে থাকতে আমিও পারব না। দৃঢ়ভাবেই বললাম—আমি এখানেই থাকব, কোন অসুবিধা হবে না, তাছাড়া প্রতিবেশীরা তো আছেনই, এদিকে সেদিকে টেলিফোন।

নার্সিং হোমে খরচ করার মত টাকা আমাদের নেই, যদিও ও বলেছিল সে না হয় ধার করা যাবে, কিন্তু আমি নিষেধ করলাম, ডাক্তারবাবুকে সে কথা বললাম। উনি বললেন, কলকাতার কোন বড় হাসপাতালে কার্ড করাতে, সেখানে অনেক রকমের ব্যবস্থা থাকে, কোন অসুবিধা হবে না। এই তো হাওড়ার শিবপুর থেকে গঙ্গা পেরোলেই কলকাতা !

অসুবিধা হয়নি, যন্ত্রণার পথ পেরিয়ে স্বাভাবিক প্রসবই হল। কিন্তু হায়, জানলাম মেয়ে হয়েছে ! ক্ষোভে দুঃখে হতাশায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল, আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। এতদিন ধরে প্রত্যেক মুহূর্তে আমি যে শরীরের মধ্যে মনে মনে লালন করেছি পুত্রসন্তান ! ওকে বলেছি—দেখো ঠিক ছেলে হবে, আমার মন বলছে। দুজনে ভবিষ্যতের কত যে সুন্দর ছবি এঁকেছি !

এই বাইশ বছরের জীবনে বহুবার যে কথাটা মনে হয়েছে—আমার জন্মানোই অন্যায়। অতএব আমার মরে যাওয়াই ভাল—সে কথাটা আবার খুব বেশী করে মনে হতে লাগল। যদিও ওর মুখে অনেক সান্তনা শুনলাম—মেয়ে হয়েছে তো কি হয়েছে, মেয়েকেও কত ভালভাবে মানুষ করা যায়।

তিনদিন পর অদ্ভুত একটা ঘটনা আমাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। সেদিন অন্য নার্স, হয়ত ডিউটি চেঞ্জ, পরিচর্যার পর কখন পাশে রেখে গেছে শিশুকে, ছিলাম আধো ঘুমের ঘোরে, তন্দ্রা ছুটে গেল কান্নার শব্দে। এ কদিন তো কান্না শুনিনি, পাশ ফিরে দেখি পাশে শোয়ানো ছেলে। বুকটা কেমন ধক্‌ধক্‌ করে উঠল, আজ ছুটি কিছুক্ষণ পরেই চলে যাব, আমি ত্রস্তে শিশুটির শরীর ঢাকলাম, কান্না থামাতে চেষ্টা করলাম। এতক্ষণ বাড়ী ফেরার জন্য বিশেষ কোন তাগিদ ছিল না, ফিরব এতো ঠিকই আছে, ও আসবে—কিন্তু সহসা আমার মনের মধ্যে ওলট পালট, মনে হচ্ছিল ওর অপেক্ষায় না থেকে একাই বেরিয়ে পড়ি, আছে তো সামান্য একটা ব্যাগ, তাতে দু একটা জামা কাপড়...

দ্বিধায় তা করা সম্ভব হল না, আমি অধীর আগ্রহে শুধু আগমন পথের দিকে চেয়ে রইলাম। এত বড় হলঘরে কত মানুষ, মনে হচ্ছিল সবাই বুঝি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কতজন চলেও যাচ্ছে।

তারপর কখন যে আমরা বেরিয়েছি, ট্যাক্সিতে উঠেছি...একেবারে বাসায় এসে তবে আমি কথা বললাম, বিছানায় শিশুকে শুইয়ে দিয়ে বললাম—দ্যাখো, ছেলে।

ও অবাক হয়ে চেয়েছিল,—এটা কি করে হলো ?

বললাম, নার্স ভুল করে দিয়ে দিয়েছে।

—কিন্তু, তোমার বলা উচিত ছিল—ও বিড়বিড় করে বলল।

আমি বললাম—কখনো নয়, ভগবান আমার মনের বাসনা পূর্ণ করেছেন, না হলে এমন ভুল হয় ! ছেলেকে কোলে নিয়ে আমি গভীর আদরে ভরিয়ে দিলাম।

পরদিন সকালে কিন্তু ভয়ের ব্যাপার ঘটল। ও খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ছুটে এসে বলল—কাগজে ব্যাপারটা বেরিয়েছে, হাসপাতালে গোলমাল, কে একজন প্রসূতি তার সিজার করে প্রসব হয়েছে, খুবই দুর্বল, ঘুমিয়ে ছিল, ঘুম ভেঙে দেখেছে পাশে শোয়ানো মেয়ে। তার নাকি ছেলে হয়েছিল, বাড়ির লোকও দেখে গেছে—এ নিয়ে গোলমাল—তারা অভিযোগ করে পুলিশে জানিয়েছে।

আমরা খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আমি বললাম—চল আমরা বর্ধমানে চলে যাই। এখানের কেউ আমাদের দেশের ঠিকানা জানে না, যদি পুলিশ আসে কেউ কিছু বলতে পারবে না।

আমরা বর্ধমান পৌঁছুলাম নির্বিঘ্নে। শাশুড়ির কি আনন্দ ! আমার ভাসুরের দুই মেয়ে, ছেলে নেই, সেজন্য শাশুড়ির বড় খেদ ছিল, নাতি কোলে নিয়ে তাঁর সব দুঃখ ঘুচে গেল।

কয়েকদিন পর ও একা বাসায় ফিরে গেল ভয়ে ভয়ে। কিন্ত না, কেউ খোঁজ করেনি। কি স্বস্তি !

তারপর আর কি বলব, স্বস্তি ঘুচল, শুরু হলো নিরবচ্ছিন্ন জীবন-যন্ত্রণা...

এখন মনে হচ্ছে ভগবান আমাকে ছলনা করেছেন। খবরটা পড়ে জানলাম তাঁরা মেয়েটিকে নিয়ে যাননি। অতএব হাসপাতালে মেয়েটি রয়ে যায়। ডাক্তার আর নার্স, আয়া আর জমাদার এদের সকলের দয়ায় মেয়েটি কিভাবে আঠারোটা মাস পার করে বড় হয়েছে। কিন্তু কি সুন্দর হয়েছে ! আর মুখটা একেবারে ওর বাবার মুখ বসানো!

পড়লাম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে কেস চলছে। কাগজপত্রেও নাকি কর্তৃপক্ষ উল্টোপাল্টা করেছে। শিশুটিকে কেসের দিন কোর্টে হাজির করা হয়েছিল, বিচারপতি তাকে দেখে নিজের কাছেই রাখতে চান। অতএব কোর্টে কাগজপত্র সই করে ওনার স্ত্রী মেয়েটিকে নিয়েছেন।

মহামান্য বিচারপতি, আপনি সত্যই মহানুভব। আর মহানুভবের কাছেই তো আশ্রয় পায় অসহায় নিরাশ্রয় প্রাণ। ছোটবেলা থেকে আমি শুধু চুপ থাকতে শিখেছি। আমার যত কথা শুধু মনে মনে, মনের কথা এমন করে কি আমার স্বামী লিখতে পারে ! তাই স্বামীর অসমাপ্ত চিঠি আমিই শেষ করলাম। ছবিটি এখন আমার জপের মালা, মনে হয় সারাক্ষণ ওটা চোখের সামনে নিয়ে অপলক তাকিয়ে থাকি। মহানুভব, আপনি বলে দিন আমি এখন কি করব।

অন্য স্বাদ

কিছুদিন ধরে বধূটির মনে সারাক্ষণ কেমন এক বিষণ্ণতা। কোনও কিছুতেই আনন্দ নেই, ভাললাগা নেই। এ ব্যাপারে সে যে খুব সচেতন ছিল তা নয়, কিন্তু অনুভব করল একদিন ভোরবেলায়।

কিছুদিন হল একটা পাখি এসে বসত করেছে জানলার পাশে আমগাছে। ভোরবেলা যখন ভাল করে আলো ফোটে না, তখন পাখিটা গান গায় আর ঘুম ভেঙে যায় বধূটির। প্রথম যেদিন ও কিছুক্ষণ গান গেয়ে উড়ে চলে গেল, ক্রমশঃ দূরে মিলিয়ে গেল কণ্ঠস্বর, তার মন কেমন করে উঠল—সে অনুভব করতে পারল তার বিষণ্ণতা। তারপর থেকে রোজ পাখিটা ঘুম ভাঙিয়ে নাড়া দিয়ে যায় তার বিষণ্ণতায়।

বিয়ে হয়ে এ-বাড়িতে এসেছে সে তিন বছর। এই তো বাঁদিকে ঘুমিয়ে তার এক বছরের শিশুকন্যা, ডানদিকে স্বামী। স্বামী তাকে খুবই ভালবাসে। সন্তানও তার সুস্থ-সবল হাসিখুশি। এ-বাড়ির সবাই---শ্বশুর, শাশুড়ি, ভাশুর, জা---তাদের দুই ছেলেমেয়ে—সকলেই তাকে ভালবাসে। সে ও। তবু কেন এই বিষণ্ণতা ইদানিং তাকে আচ্ছন্ন করে, সে বুঝতে পারে না। কোথাও কোনও অভাব-অনটন নেই, মোটামুটি সচ্ছল পরিবার, তবু...

আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নেমে সে দরজা খুলে বাইরে এল, বারান্দায় দাঁড়াল। মাটির দোতলা বাড়ি, বাঁশের ফালি দিয়ে ঘেরা বারান্দা, কাঠের থাম। হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে, আনমনে দেখল নীচে উঠোন ধানের মরাই, তার ওপাশে কলাগাছের ঝাড়, লাউয়ের মাচা, তুলসীমঞ্চ—সবই কেমন বিষণ্ণ।

নিত্যকার সেই একই কাজ...উঠোন ঝাঁট দেওয়া, দোর নিকানো, বাসন ধোওয়া...একঘেয়ে। ওই—গরুগুলো ডাকতে শুরু করল।

ইদানিং তার বড় বেশি মনে পড়ে স্কুলজীবনের কথা। বিশেষত মাধ্যমিকের দিনগুলি...সকালে পড়তে বসা, স্নান খাওয়া, তিন কিলোমিটার দূরের স্কুলে সাইকেল চালিয়ে যাওয়া...সবিতা, মাধুরী, লক্ষ্মী—চার বন্ধু। মাঝে মাঝে সাইকেলের রেষারেষি! কত গল্প, খেলা ! উচ্চ মাধ্যমিক আর পড়া হয়নি। সে স্কুল আরও দূরে, খরচও অনেক। সুতরাং বিয়ের দেখাশোনা আর অপেক্ষা। অতঃপর পশ্চিম মেদিনীপুরের এক গ্রাম থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের আর এক গ্রামে।

গরুগুলো খুবই ডাকাডাকি করছে—ধীর পায়ে নেমে এল সে। আজ আবার বিশেষ রান্নাবান্না। কলকাতা থেকে কারা যেন আসবেন, ছ'-সাতজন মানুষ, এই গ্রামের কী যেন সব ছবি নেবেন—তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা। শ্বশুরমশাই পঞ্চায়েতের সদস্য, তাঁর ওপর দায়িত্ব পড়েছে। গতকাল রাতেই তাঁরা পৌঁছে গেছেন, উঠেছেন কুড়ি কিলোমিটার দূরে টাউনের হোটেলে, এসে পড়বেন নটা নাগাদ।

—মাংসটা কিন্তু বড় বউমা রান্না কোরো। মাংসের প্যাকেটটা রান্নাঘরে সামনে নামিয়ে বললেন শ্বশুরমশায়,—জলখাবারের কী ব্যবস্থা করা যায় বলো তো ?

—মুড়ির সঙ্গে তেলেভাজা করে দিলে হয় না ? বড় বউমা বলল।

—কী যে বলো ! কলকাতার লোক, ওঁরা কি মুড়ি তেলেভাজা খাবেন।

—তাহলে কি লুচি-আলুভাজা আর মিষ্টি দেবেন ?

—হ্যাঁ, তা হতে পারে, আর চা, শুনেছি কলকাতার লোকেরা এখন দুধ ছাড়া লিকার চা খায়।

—একটা গাড়ি আসছে বাবা, বলল সে।

রান্নাঘরের ভেতর থেকে উঠোন পেরিয়ে সোজা কিছুটা রাস্তা দেখা যায়, সে দেখল লাল রঙের একটা গাড়ি এগিয়ে আসছে।

—আপনি যান বাবা, দেখুন।

মোরাম রাস্তার ওপর দিয়ে হেলতে দুলতে এগিয়ে আসছে লাল রঙের বড় গাড়ি, মাথার ওপর কীসব বাঁধা, গৃহকর্তা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন।

—এটা কি সঞ্জয়বাবুর বাড়ি ? গাড়ি থামিয়ে ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করলেন একজন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই, আসুন।

ঝকঝকে লাল রঙের গাড়িটা কী সুন্দর—মনে হল তার। সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ছ'জন মানুষ নেমেছেন উঠোনে, একজন বয়স্ক—কাঁচাপাকা চুল, বাকিরা কমবেশি বয়সের যুবক। একজনের আবার কানে একটা মাকড়ি পরা।

—দেখো দেখো বড়দি, হাসতে হাসতে গলা নামিয়ে বলল সে, একটা কানে কেমন মাকড়ি পরেছে।

প্লাস্টিক চেয়ার, কাঠের চেয়ার, টুল ইত্যাদি সব মিলিয়ে ছ'খানা উঠোনে জড়ো করেছে বাবা আর দুই ছেলে মিলে। পাঁচজন বসলেন। কানে মাকড়ি অবাক চোখে চারদিকে দেখতে দেখতে বলল, কী সুন্দর বাড়িটা মুকুলদা ! আহ ! ছবির মতো সুন্দর! ওই দোতলার বারান্দার কাছে কলকাতার মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিংয়ের বারান্দা কোথায় লাগে !

ছটফটে ছেলেটা এদিক দেখছে, ওদিক দেখছে, ওটা কি ধানের মরাই ? কী সুন্দর! ওর পাশে কলাগাছের পাতা কেমন হেলে আছে ! আহ ! বিউটিফুল !

আঁচলে মুখ চেপে হেসে কুটোপুটি সে। এই বাড়ি কী সুন্দর, মরাই সুন্দর, কলাগাছের পাতাটও সুন্দর—পাগল নাকি রে বাবা !

—এই, অত হাসিস না, শুনতে পাবে। বড় বউ ধমক দিল।

—ক্যামেরা বার করব মুকুলদা ? দুটো হাত সোজা মুখের সামনে ছড়িয়ে বুড়ো আঙুল দুটো পরস্পরের মাথায় ঠেকিয়ে অদ্ভুত এক ভঙ্গি করে এপাশ ওপাশ দেখতে দেখতে প্রশ্ন করল কানে মাকড়ি।

এ আবার কী দেখার ভঙ্গি। এ ছেলে সত্যি পাগল ! আবারও হাসি আসছে।

—জয়দীপ, ক্যামেরা নামাও, বললেন কাঁচাপাকা চুলের ভদ্রলোক। উনিই তাহলে মুকুলদা।

জয়দীপ নামের ছেলেটি এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে।

—জলখাবার কী খাবেন বলুন, তেলেভাজা মুড়ি, না লুচি আলুভাজা ?

—শুনুন, এই কিছুক্ষণ আগে আমরা হোটেল থেকে খেয়ে বেরিয়েছি, আপনি ওসবের ব্যবস্থা করতে যাবেন না, দুপুরে ডালভাত যা খাওয়াবেন খাব। এখন শুধু চা, লিকার চা অল্প চিনি দিয়ে। এখন অনেক কাজ, আপনার বাড়ির ছবিটা নিক, তারপরই বেরিয়ে পড়ব। আপনি সঙ্গে থাকবেন, সব কিছু দেখিয়ে দেবেন। প্রাচীন সেই ভাঙা গড়, মন্দির, পদ্মসায়র...

ক্যামেরা নেমেছে। আরও কৌতুলী তার চোখ। কত বড় ক্যামেরা। যেন এক বছরের বাচ্চা কোলে করে আছে। তিন ঠ্যাং একটা ঠেকনার ওপর ক্যামেরা বসানো হল। উঠোন থেকে চেয়ার-টেয়ার সব সরিয়ে দেওয়া হল। সবাই চলে গেল ক্যামেরার পিছনে। কানে মাকড়ি ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে অদ্ভুত সব ভঙ্গিমায় ক্যামেরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাড়ির ছবি তুলতে লাগল।

তার মনে হচ্ছিল ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, কাছ থেকে সব দেখে, ক্যামেরায় একটু চোখ লাগায়।

—প্যান করে রাস্তার কিছুটা নিয়ে নিস্ রনি, মুকুলদা বললেন।

যেমন সব পোশাক তেমন নাম। ভাবল সে। আবার হাসি এল, রনি মানে কী ?

চা খাওয়ার পর সকলকে কুড়িয়ে নিয়ে গাড়িটা যখন বেরিয়ে গেল, তার মন ছুটতে চাইছিল ওদের পিছু পিছু...ওই গড়ের ধারে...মন্দিরের অলিন্দে...পদ্মসায়রের কিনারায়...

ফিরে এসে খেতে বসতে বেলা দুটো। দুয়ারে একটা লম্বা বেঞ্চ পেতে তার ওপাশে প্লাস্টিক চেয়ার কাঠের চেয়ার টুল সব সাজিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা। প্যান্ট পরে মেঝের বসে কি আর খেতে পারবেন বাবুরা ! দুই বউ মিলে পরিবেশন। বেগুনভাজা, মাছের মাথা দিয়ে ডাল, ঝিঙে-আলু পোস্ত, মাছের ঝাল, মাংস, আমের চাটনি।

—ওরে বাপ রে ! এ যে ভুরিভোজ—সকলের হইহই।

—ও মুকুলদা, ক্যামেরা বসাব ? এত সব খাবারের ছবি তুলে রাখলে হত না ? কানে মাকড়ি বলল, ইতিমধ্যে সে বউদি-বউদি করতে শুরু করে দিয়েছে, উঃ ! পোস্তটা কী দারুণ হয়েছে ! কোন বউদি এটা রেঁধেছে ? বড় বউদি না ছোট বউদি? আর একটু দাও তো।

—দু'জনে মিলেই সব রেঁধেছে, গৃহকর্তা দু'হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে, ভাল হয়েছে শুনে খুব আনন্দ হচ্ছে। আচ্ছা, এসব ছবি দিয়ে কী হবে ?

—একটা তথ্যচিত্র। মুকুলদা বললেন।

—এটা কি টিভিতে দেখানো হবে ?

—টিভির প্রোগ্রাম নয়, এ আরও বড় জায়গায় দেখানো হবে, বিদেশেও। বাংলা, ইংরেজি দুটো ভাষাতেই হবে। বললেন মুকুলবাবু, মাংসটা বড় ভাল রেঁধেছে বউমারা।

—ওঁকে আর একটু দাও বড় বউমা...

—আরে না না, ভাল বললাম বলেই কি আরও খাব ? হাঃ ! হাঃ ! এখনও কত কাজ বাকি। এত খেলে শুয়ে পড়তে হবে। হ্যাঁ, বলছিলাম কী আমাদের কতগুলো ঘরোয়া শট নেওয়ার আছে, এই যেমন দোলাতে বাচ্চাকে শুইয়ে দোল দিচ্ছে মা, তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দিয়ে শাঁখ বাজাচ্ছে, লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ছে। বউমারা করলে কোনও অসুবিধা নেই তো সঞ্জয়বাবু ?

—না না, অসুবিধার কী আছে ?

—কী গো বউমারা, তোমরা কী বলো ?

—আমরা কি পারব ? বলল সে। বড় বউ চুপ।

—না পারার কী আছে ! তোমাদেরই কাজ তোমরা করবে। লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়তে পার তো ? লক্ষ্মীর পাঁচালি আছে বাড়িতে ?

—ছোট বউমা পারে, ছোট বউমা আমার মাধ্যমিক পাস, বাংলায় লেটার।

—তাই নাকি ! বাঃ ! বাঃ ! এ তো মেঘ না চাইতে জল ! এমন গুণবতী মেয়ে পেয়ে গেলাম ! আর দোলনা ? শিশু ?

—ওই তো দড়ির দোলনা দুয়ারে টাঙানো, গোটানো আছে। দোলনা আমাদের এখানে সব বাড়িতেই পাবেন। ছোট-বড় সবাই দোলে। আর, আমার ছোট নাতনিটা তো এই এক বছরের।

—হাঃ ! হাঃ ! কী বুঝছ বিকাশ ? একেই বলে সৌভাগ্য ! সব কিছুই একেবারে হাতের কাছে। দেখো দেখো, দোলনা, তুলসীমঞ্চ, ঠাকুরঘর কী ভাবে কী নেবে। রনি, খুব মন দাও, খুব গুছিয়ে কাজটা তুলতে হবে।

বাড়ির দু'জন ছেলেমেয়ে শুধু খেয়েছে। অতিথিদের খাওয়া হল। এবার কর্তামশাই আর দুই ছেলে, তারপর মেয়েরা। তার মন এমন ছটফট করছিল, খিদে পালিয়েছে কোথায়। মনে হচ্ছে এখনই গিয়ে ওদের সঙ্গে কাজ শুরু করে।

—চুল আঁচড়ে একটা এলো খোঁপা করে নাও। মুখটা ভাল করে মুছে নাও। একটা পরিস্কার আটপৌরে তাঁতের শাড়ি পরে নাও। বাচ্চাটা কোথায় ? দোলনায় বিছানা করে শুইয়ে দাও—মুকুলদা বললেন।

মেয়েকে একটা ভাল করে জামা পরাল সে, কপালে কাজলের টিপ। ড্যাব-ড্যাব করে দেখছে মেয়ে।

উঠোনে একটা মানুষ প্রমাণ আয়না বসিয়েছে। আয়না নয় ঠিক, কাচের বদলে রাংতা দেওয়া। একজন সেটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সূর্যের আলোটা ফেলছে দুয়ারে। দুয়ার আলোয় আলোময়।

দোলায় শুইয়ে দোল দিতে মেয়ের কী খিলখিল হাসি।

—আহ ! কী মধুর হাসি ! বললেন মুকুলবাবু, সাউণ্ড চেক করো বিকাশ, আঃ, সব কিছু রেডি থাকে না কেন ? তাড়াতাড়ি করো, আবার এমন হাসি কি হাসবে ও ?

মেয়ে কিন্তু হেসেই চলেছে। আহা ! আমার মেয়ে তো—ভাবল সে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোল দিচ্ছে, এলো খোঁপার ওপর আধো ঘোমটা। সামনে তিন ঠ্যাং-এর ওপর ক্যামেরা। শুধুই ওই দিকে চোখ চলে যায়।

—না না বউদি, মেয়ের দিকে দেখো। রনি বলল, আমি কিন্তু একদম আপনি বলতে পারি না, রাগ কোরো না যেন।

রাগ করবে কী, মেয়ের মতো তার নিজেরও খিলখিলিয়ে হাসতে ইচ্ছে করছে। অনেক কষ্টে হাসিটাকে ঠোঁটের কোণায় চেপে রেখেছে।

—খুব ভাল হয়েছে, একেবারে এক চান্সে ও. কে. ! কী রনি ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ মুকুলদা, বউদি আমার ভেরি গুড আর্টিস্ট ! এবার মেয়েকে তুলে কারও কোলে দিয়ে দাও।

মেয়েকে তুলে স্বামীর কোলে দিল সে, আর সঙ্গে সঙ্গে রনি ক্যামেরাটা তিন ঠ্যাং থেকে খুলে নিয়ে কোলে করে দোলনায় শুয়ে পড়ল।

—এবার বুড়ো খোকাকে একটু দোল দাও আর ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে থাকো।

সে হতভম্ব। উঠোনে ভিড় জমেছে, একেবারে আবালবৃদ্ধবনিতা বলতে যা বোঝায়। সে সকলের দিকে তাকায়।

—বুঝতে পারলে না ? মুকুলবাবু বললেন, তুমি মেয়ের দিকে তাকিয়ে দোল দিচ্ছিলে সেটা ছবি তোলা হল, আর মেয়ে হাসতে হাসতে যে তোমার দিকে তাকিয়ে ছিল সেটাও তো দেখাতে হবে। ক্যামেরা এবার সেটা তুলবে। ক্যামেরাটাই যেন তোমার মেয়ে, এভাবে তাকিয়ে থাক।

বুঝল সে।

—নাও নাও, তাড়াতাড়ি করো, এবার বুড়ো খোকাকে একটু দোল দাও, রনি বলল।

দোল দিতে থাকল সে হাসি হাসি মুখে, মনে মনে বলল, পারলে তোমার মাকড়ি পরা কান মুলে দিতাম, দুষ্টু ছেলে।

ওদিকে তখন ঠাকুর ঘরের দুয়ার সুন্দর সেজে উঠেছে। বড় বউ নিপুণ হাতে আলপনা এঁকেছে। সারি সারি লক্ষ্মীর চরণ, ঘট বসিয়ে সিঁদুর দিয়েছে, আম্রপল্লব ডাব এনে দিয়েচে তার ভাশুর। একরাশ দেলনচাঁপা ফুল এনে দিয়েছে পাড়ার ছেলেরা, মালা গাঁথতে বসেছে বড় বউ।

—বিকাশ, এটা কিন্তু 'নাইট এফেক্ট' হবে, সামনে কালো কাপড় ঢেকে দাও, ব্যাটারি নামাও গাড়ি থেকে, একটা আলো আনা। মুকুলদা নির্দেশ দিতে থাকেন, প্রদীপ জ্বেলে দাও, আর ধূপ, একটু ফল-বাতাসা সাজিয়ে দিতে হবে।

—চিঁড়ে মুড়কি বাতাসা সবই আছে বাড়িতে কিন্তু ফল ? সঞ্জয়বাবু বললেন।

—ঘরে একটা বড় পেয়ারা আছে। বড় বউ বলল।

—একটা শশা তুলে আন না রে কেউ গাছ থেকে—একজন ছুটল।

—লালপাড় গরদের শাড়ি আছে বউমা ? আছে ! বাঃ ! তাহলে ওটা পরো আর ছেলেমেয়েদের জামাটামা পরিয়ে বসিয়ে দাও। বাড়ির গিন্নিও বসুন না সামনে, আর বউ বউ।

কিন্তু বাড়ির গিন্নি যে কোন কোণে লুকিয়ে পড়েছেন, খুঁজে পাওয়া গেল না।

ফুলের মালায়, ধূপের গন্ধে, প্রদীপের আলোয় সব কিছু ঝলমল।

—কী সুন্দর ! কী সুন্দর ! রনি বলেই চলেছে, আহা ! লালপাড় শাড়ি পরে ছোট বউদি কী সুন্দর ! একেবারে মা লক্ষ্মী। তাই না মুকুলদা ?

অনেক কষ্টে হাসি চাপে সে।

সুরে সুরে দুলে দুলে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ে সে, মনপ্রাণ উজাড় করে লক্ষ্মীর বন্দনা করে—

জয় জয় মহালক্ষ্মী ত্রৈলোক্যতারিণী
প্রণামি চরণে মাগো সর্বহিতৈষিণী
দেবদেবেশ্বরী তুমি সার হৈতে সার
ভুবনজননী তব পরে নমস্কার
জগন্মাতা মাগো তোমার চরণযুগ ধরি
হৃদি মাঝে দয়াবতী নাম সদা স্মরি...

সামনে ক্যামেরা, পায়ের কাছে শোয়ানো মাইক, চড়া আলো জ্বলছে মুখের সামনে—ধরে রেখেছে একজন, নির্দেশমতো আলোটা কখনও তফাতে কখনও একেবারে কাছে আনছে। কিন্তু এসব তার মনঃসংযোগে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে না। কী অপরূপ গ্রন্থনা তার...

—ওয়েল ডান ! খুব ভাল করেছ ! তুমি তো খুব গুণবতী মেয়ে ! এখন পড়াশোনা কিছু করো ?

—এখন আর কী পড়ব ?

—আরে, ইস্কুল-কলেজে না গেলে কি পড়াশোনা করা যায় না ? রবীন্দ্রনাথ কি স্কুল-কলেজে গিয়েছিলেন ? পাস করার জন্য পড়ার চেয়ে ভাললাগার জন্য পড়া অনেক বেশি মূল্যবান। তুমি বাংলায় লেটার পেয়েছিলে, সাহিত্য পড়ো। আর লিখবে, যা মনে আসে লিখবে। এখানে লাইব্রেরি নেই সঞ্জয়বাবু ?

—হ্যাঁ আছে।

—কিছু মনে করবেন না, আপনি কি বউমাদের পড়াশোন না করার পক্ষপাতী ?

—ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন, বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি আমাদের জেলা, আসলে এভাবে কেউ ভাবে না।

—তবে ? বই এনে পড়বে। ইচ্ছা থাকলে সময়ের অভাব হয় না। নাও এবার তুলসীতলা, সন্ধ্যাপ্রদীপ, শাঁখ বাজানো।

একটি কাঁসার থালার ওপর জ্বলন্ত প্রদীপ, শাঁখ, ধূপকাঠি সাজিয়ে দু'হাতে ধরে সে ধীর পায়ে এগিয়ে যায় তুলসীমঞ্চের দিকে। ক্যামেরা চলছে—হাঁটু মুড়ে বসল সে, থালা নামিয়ে রাখল।

—কাট—এবার ক্যামেরা সমানে—প্রদীপ রাখো।

তুলসীমঞ্চের নীচে প্রদীপ রেখে, ধূপ জ্বালিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম, শাঁখ নিয়ে তিনবার ফুঁ।

—আর একবার শাঁখ বাজাও বউমা, এবার পাশ থেকে নাও রনি।

আবার শাঁখে ফুঁ তিনবার।

—ভেরি গুড ! ভেরি ভেরি গুড ! মুকুলবাবু বললেন।

—এক্সেলেন্ট ! রনি উচ্ছ্বসিত।

—আর একটা শট নেব বউমা, তোমাকে খুব খাটাচ্ছি।

—কী যে বলেন। আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না।

—ছেলেমেয়েরা, তোমাদের বই-খাতা আনো, অন্ধকার তো হয়েই গেল, বউমা বাচ্চাদের পড়াবে। যেখানে দোলার শট নেওয়া হল ওইখানে মাদুর পাতো, তুমি কি ওদের পড়াও ?

—না তো।

—পড়াবে অন্য বাড়ির ছেলেমেয়ে যাদের পড়ানোর কেউ নেই, তাদেরও দু'-একজনকে ডেকে নেবে। লেখাপড়া শিখছে কাজে লাগাও, সেটাই হবে সংসারের জন্য, সমাজের জন্য তোমার অবদান। অনেক জ্ঞান দিয়ে ফেললাম নাকি ? কিছু মনে করছ না তো ? কী সঞ্জয়বাবু ?

—কী যে বলেন ! ঠিকই তো বলছেন।

আবার ক্যামেরা, আবার মাইক, আবার শট।

গরদের শাড়ি ছেড়ে ছাপা শাড়ি পরল সে, পড়তে বসা হল মাদুর পেতে।

এবার কবিতা—

ওই খানে মা পুকুরপাড়ে
হিজল গাছের বেড়ার ধারে
হোথায় হবো বনবাসী

কেউ কোথাও নেই...

—ওঃ ! বউদি ! একটু পায়ের ধুলো দেবে ?

—এই রনি, কী হচ্ছে কি ? মুকুলদা ধমকে উঠলেন।

—সত্যি বলছি মুকুলদা, সিরিয়াসলি, কী সুন্দর আবৃত্তি, বলো !

ছবি তোলার পর ক্যামেরার একটা ছোট কাচে ছবি দেখে নিচ্ছিল ওরা।

—একটু দেখব ? সে বলল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, রনি ওকে একটু দেখাও।

ছোট পর্দার মধ্যে সে নিজের ছবি দেখে—চলন্ত সিনেমা !

—আচ্ছা, আপনারা ওই যে গড়ের ছবি তুলেছেন, ওটা একটু দেখা যাবে ? ওই গড়টা আমি দেখিনি। সঙ্কোচের সঙ্গে বলল সে।

—সে কী ? মুকুলদা অবাক, তোমাদের গ্রামের শেষে এমন ঐতিহাসিক একটা জিনিস, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া—দেখা হয়নি ?

—বেরোনো হয় না।

—মন্দির যাও না?

—ওই, বছরে একদিন।

—না না, এরকম ভাবে জীবন কাটিও না। একটু একটু বেরোবে। সপ্তাহে একদিন অন্তত মন্দিরে যাবে। শুধু পুজোর জন্য নয়, রোজের কাজের মধ্যে ওটা একটা ব্যতিক্রম। মন্দিরে যাওয়ার দিন সকাল থেকেই তার প্রস্তুতি, দেখবে মনের মধ্যে একটা অন্যরকম হাওয়া বইবে। মাসে একদিন ছেলেমেয়েদের নিয়ে গড়ের দিকে বেড়াতে যাবে, পদ্মসায়রের ধারে বসবে, কবিতা বলবে, গান করবে, দেখবে মন ভাল হয়ে যাবে। নতুন উদ্যম উৎসাহ পাবে কাজে। কী সঞ্জয়বাবু ?

—ঠিকই বলেছেন, আসলে আমরা এভাবে তো ভাবিনি কখনও। বারণ তো কিছু নেই।

—মানুষ নিজেই নিজের জীবনটাকে একঘেয়ে করে তোলে। আপন মনে বলেন মুকুলবাবু, আমি তো এজন্যই ক্যামেরা কাঁধে বেরিয়ে পড়ি, পথে পথে ঘুরে বেড়াই।

দিনটা কাটল যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখার দিন। রাতে অনেকক্ষণ তার ঘুম আসেনি, শেষ রাতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল, ভোরবেলা পাখির ডাকে তার ঘুম ভাঙল। ধীর পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল সে। পাখিটা গান গাইতে গাইতে কোথায় চলে গেল কে জানে ! কী বলে গেল ?—কী সুন্দর কী সুন্দর কী সুন্দর দিন ! ভোরের বাতাস মৃদু মৃদু নাড়া দিয়ে যায় গাছেদের পাতায় পাতায়, কী বলে যায় ? কী আনন্দ কী আনন্দ কী আনন্দের দিন ! গরুটা ডাকছে, বাইরে যাবে, ব্যগ্র আনন্দে...

উঠোনে নামার জন্য পা বাড়াল সে।

স্বপ্নের উড়ান

(বিধিসম্মত সতর্কীকরণ—ধূমপান ও মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।)

ইচ্ছেটা মনের মধ্যে মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দেয়। আমার নয়, আমার বন্ধু কালুর, বলে—বাড়ি যদি বানাতে হয় তো পাহাড়ের ওপর। তবে কিনা কলকাতা শহরেতে চাই।

—কিন্তু এ যে সোনার পাথরবাটি চাই। কলকাতাও চাই, পাহাড়ও চাই !—বলি আমি।

—রয়েছে তো, দেখতে পাস্ না, অমন হাওড় ব্রিজ রয়েছে, ওর ওপর বানাবো হাওয়ামহল—আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বলে কালু।

—ঠিক, ঠিক,—শান্তনু বলে।

—আরে প্রথমে তো ভাবনা—ওটাই তো আসল—কালু বলে।

—ঠিক, ঠিক,—সায় দেয় শান্তনু।

—তারপর Plan, *তারপর* Plan Sanction, *তারপর রূপদান। বাড়ির চেয়ে সিঁড়ির খরচই হবে হাজারগুণ।*

—তা পাহাড়ের ওপর বাড়ি করতে গেলে সিঁড়ির খরচ তো হবেই। সিঁড়ি ছাড়া তো বাড়িতে যাওয়াই যাবে না—শান্তনু সায় দেয় আবার।

*এসব পরিকল্পনা শুনে আমি বললাম—*Objection

—কেন ?

—রবীন্দ্রনাথের মাথার ওপর তুমি বসত করতে পারো না, তিনি তো গুরুদেব।

—আঃ ! জ্বালা ! সেতুর নামটা কে করে যে কবির নামে হয় ! অন্তত নদীর নামটা তবু রবীন্দ্রনদী হলে চলত। বিদেশে কোথাও আছে নাকি ? সেক্সপীয়র সেতু কিংবা ওয়ার্ডসওয়ার্থ ব্রিজ ? কে জানে !

—তাহলে GOOGLE *দাদুকে জিজ্ঞাসা করলে হয়।—শান্তনু বলল।*

—যাকগে অত ঝামেলায় দরকার নেই,—কালু বলল—প্রাণের বন্ধুর যখন আপত্তি আমি ওই প্রকল্প বাতিল করলুম।

কালু, শান্তনু ও আমি যখন তরলাসরে বসি তখন এরকম বিশাল বিশাল আলোচনা হয়েই থাকে। আমাদের দেশে নামকে লোক বড় খেলো করে ফেলে। কালুর নাম কালোসোনা, তাকে সবাই কালু করে নিয়েছে। কালু কবিতা লেখে। ছোট বড় দু-একটা কাগজে পাঠায়, কালোসোনা নামেই পাঠায়, কিন্তু ছাপা হয় না। আমি ওকে বলি—ওই নামের জন্যই ছাপা হয় না রে। নাহলে কবিতা তুই তো ভালোই লিখিস।

যদিও আমি কবিতার ধারেকাছে ঘেঁষি না, নেহাৎ পাশ করার জন্য স্কুল কলেজে কিছু পড়তে হয়েছিল, ব্যস্। কিন্তু কালুর কবিতা শুনতেই হয়। যদিও পড়তে চাই, কিন্তু ও বলে—আবেগের মিশেল দিলে তবেই কবিতা ভালো লাগে, শোন। তা শুনতে তো বেশ লাগে, যদিও বুঝি না, তাই বলি নামের কথা।

—কেন দুঃখ দিস ?—কালু বলে।

—না, না, দুঃখ দেবো কেন ? কালোসোনা নামটা বড্ড শিশু শিশু মনে হয় না ? বল ?

—কালিদাস তাহলে কি করে অত বড় কবি হলেন ?—বলতে বলতে কালু কেমন উদাস হয়ে যায়, বলে—ইচ্ছে ছিল পাহাড়ের ওপর বসে Laptop নিয়ে লিখবো আধুনিক ধারায় কোনো মেঘদূত কাব্য। বিরহী যক্ষের নিশ্চয় Laptop ছিল। দেখনা, এখন তো চিঠিপত্র কেমন Cloud-এর মধ্যে রাখা যায়। এতো আমাদের বহু পুরানো পদ্ধতি, আসলে প্রযুক্তি হারিয়ে গেছে আর সেগুলো খুঁজে নিয়ে বিদেশিরা বলছে তাদের আবিষ্কার !

—হতে পারে।

—হতে পারে মানে ? আলবৎ হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা অত্যন্ত উন্নত ভাষা, এত সাহিত্য হয়েছে আর বিজ্ঞান হয়নি ? সব হারিয়ে গেছে। শুনেছি কালিদাসের রচনাও হারিয়ে গিয়েছিল, কোন এক সাহেব নাকি খুঁজে বার করেছেন, আহা ভাগ্যিস খুঁজে বার করেছেন, তাই তো আমি রসাস্বাদন করতে পারছি। কি সুন্দর করে যে বর্ণনা করা যায় সংস্কৃতে !—মেঘদূতে কালিদাস কেমন লিখেছেন—

শ্রোণীভারাদ্ অলসগমনা স্তোকনম্রাস্তনাভ্যাং...

একটুও অশ্লীল মনে হয় না—

তরলাসর জমে ওঠে...কালুর বকবকানি বেড়ে চলে...

পথে কোনো সুন্দরীর গমনের তাকিয়ে কালু আত্মগতভাবে বলে—শ্রেণীভারাদ্ অলসগমনা...I can walk hundred miles...কিংবা কোনো সুন্দরীর আগমনের দিকে তাকিয়ে বলে—স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং... I can die hundred times !

—আচ্ছা কালু, hundred times কেন ? Thousand times নয় কেন ?

—কালু শুনতেই পায় না। বলে—পাহাড়ের ওপর বাড়িও হল না, আমার কাব্য লেখাও হল না। আসলে প্রেমই এলো না জীবনে ! কাব্য হবে কি করে ! ভরা এ যৌবন...এখনো কোনো চকিত হরিণী প্রেক্ষণা'র দেখা পেলাম না, যার চোখে চোখ রাখলে দুলে উঠবে ভুবন, শিহরিত হবে আনন্দে...বাতাসে ভরে উঠবে চন্দনের গন্ধ...

সিগারেটের মশলা বার করে দিয়ে তার মধ্যে গঞ্জিকা পুরে দিয়ে কলেজজীবনে আমরা কখনও সখনও ধুম্র সেবন করেছি, ভালো লাগেনি। সেও দশ বছর আগের কথা। এখনকার মতো ছাত্রজীবনে তরলের চল তখনও হয়নি।

এখন আমরা তরলে কিছু মজা পাই, কালুর Version-এ অনেক বিখ্যাত কবি তরলে সরল ছিলেন। সমর সেনের নাম বলে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বলে। গুরুদেব সম্বন্ধে বলে—গুরুনিন্দা করতে নেই—তবে এটা নিন্দা না প্রশংসাও হতে পারে,—যৌবনে শীতের বিদেশে যখন থাকতেন, পার্টিতে যেতেন, সুন্দরী বিদেশিনিদের সঙ্গে Dance করতেন, Dinner খেতেন তখন Sherry Champagne-

—কি হচ্ছেটা কি ?—আমি ধমকে উঠলে—

—ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে, এই মুখ বন্ধ করলুম—

প্রাচীন কবি কালিদাসভক্ত কালুর প্রিয় তিন আধুনিক কবি। বিষাদাচ্ছন্ন হলে সমর সেনের কবিতার একটি পংক্তি বলে—

'আমার ক্লান্তির পরে ঝরুক মহুয়া ফুল,

নামুক মহুয়ার গন্ধ...'

গর্বিত কোনো সুন্দরীর উদ্দেশ্যে বলে—

'আমি মুখে অঙ্গুরী ছোঁয়াবো

আমি বিষপান করে মরে যাবো'

এটা নাকি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা।

এসব কথা কালু বলে, আমি শুনি, বেদনা অনুভব করি, মনে মনে প্রার্থনা করি কালুর কবিতা যেন ভালো হয়, যেন ছাপা হয়, আর খুব নাম হয়। কিন্তু তখনই মনের মধ্যে খট্‌কা লাগে, তখন অনুরোধ করি নামটা পাল্টাবার জন্য।

কালু ও আমি প্রাইমারি থেকে এক ক্লাসের বন্ধু হলেও মাধ্যমিকে দুবার পিছিয়ে গিয়ে তৃতীয়বারে পাশ করেছিল। কালু বই পড়ে অনেক, কিন্তু পাশ করার বই পড়ে না। সেই যে চতুর্থ শ্রেণীর বাংলা বইতে একটা গল্প ছিল—বিভূতিভূষণের—অপু দুর্গার গল্পের অংশ—সেই গল্পটা হঠাৎ এভাবে শেষ হয়ে গেল—'রামি গোয়ালিনী গাই দুইতে আসায় কথাটা চাপা পড়িয়া গেল'—সেই যে কালুর মাথায় ঢুকল—তারপর কি হলো, অপু দুর্গা তারপর কি করল ?

—এ তো ভারী মুশকিল, তারপর আর কি ?

কিন্তু কালু ক্লাশে পড়ানোর সময় বাংলা স্যারকে জিজ্ঞাসা করে ফেলল—স্যার তারপর কি হলো ?

স্যার কিছুক্ষণ চুপচাপ কালুর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—তুমি টিফিনের সময় আমার সঙ্গে দেখা কোরো।

ভয়ে আমরা দুজনেই মুষড়ে পড়লাম, কিন্তু যেতেই হবে, তাই কালু গেল, বেশ কিছুক্ষণ পরে হাসিমুখে ফিরল একটা বই নিয়ে, বলল—লাইব্রেরি থেকে স্যার বইটা দিলেন, এই বইতেই তারপর কি হলো আছে। কালু তখনই পড়া শুরু করে দিলো। সেই কালুর গল্পের বইপড়ার শুরু। স্কুলের লাইব্রেরি থেকে প্রায় রোজ একটা করে বই নেয় আর ফেরত দেয়। এভাবে স্কুলের লাইব্রেরি থেকে পাড়ার লাইব্রেরির ছোটদের বিভাগ, ছোটদের থেকে বড়দের বিভাগ—কালুর আর পাশ করার পড়াটা পড়া হল না। উচ্চমাধ্যমিক আর পার হওয়া হলো না। কিন্তু কালু বইয়ের পোকা হয়ে গেল।

কালিদাস—কালুর প্রিয় কবি, প্রিয় গ্রন্থ মেঘদূত। সংস্কৃত সহ বাংলা অনুবাদ ওকে যে কত সময় পড়তে দেখি।

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম—কি আছে এত ওই বইটার মধ্যে ? এতবার পড়েও আশ মেটে না ?

—কাব্য যে কি—এর প্রতিটি শব্দের মধ্যে মৌচাকে মধুর মতো জমে আছে—বলল ও, 'মেঘদূত'-এর একটা পাতা খুলে আমাকে পড়তে দিল, পড়লাম—

তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবাণীরশাখং
হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে লম্বমানস্য ভাবি
জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ।।

কিছুই বুঝতে পারলাম না,—বললাম আমি—তবে—'মুক্তরোধোনিতম্বম্' আর 'বিবৃতজঘনাং' শরীরে কেমন শিহরণ দিচ্ছে। 'মুক্ত নিতম্ব' 'বিবৃতজঘন'—জঘন মানে তো উরু—মানে বিবৃত উরু—বাবাঃ !

—এতেই অস্থির ? পাতা উল্টে ব্যাখ্যাটা পড়ে নে—

পড়া শুরু করলাম—

মেঘ গম্ভীরা নদীর ওপর এখন লম্বমান—দেহের বাসনটা বড় স্থূল হয়ে দেখা দিয়েছে। গম্ভীরার জল গ্রীষ্মে নীচে নেমেছে, সুতাং দুদিকে সাদা তটভূমি যেন সুন্দরীর অনাবৃত নিতম্ব। শুধু নীলাম্বরখানা কোনোক্রমে ধরে আছে, লজ্জার ওইটুকু অবশিষ্ট। ভাগ্য ভাল দুইদিকে বেতসশাখা ছিল ওই শাখা হাত হয়ে নীলবসনটুকু ধরে আছে।

কিঞ্চিৎ করধৃতম্—হাত দিয়ে বসন টেনে একটু নিবারণমাত্র। সহজ লাভের বস্তু নয় সে মুগ্ধার আত্মসমর্পণ। অন্তরে বাসনা আছে, বাহিরে শিথিল আচ্ছাদন, নিষেধে নিরুদ্ধ সেটা। তাই কেঁপে কেঁপে বেতস-শাখা বাহুতে নীলবসন কোনোরকমে টেনে আছে শ্রীমতী ত্রপাময়ী গম্ভীরা। অন্যদিকে বসনখানা কিন্তু 'মুক্তরোধোনিতম্বম্' হয়ে গেছে। আর এদিকে কামকামী আষাঢ়ের তরুণ মেঘ লম্বমান—ঝুঁকে পড়েছে, প্রায় জঘন আরূঢ়। সেই জঘনারূঢ় মেঘ ওকে ছেড়ে যেতে পারবে না। কারণ জ্ঞাতাস্বাদ পুরুষ কোনকালেই কোন বিবৃতজঘনাকে ছেড়ে যেতে চায় না। এমন অবস্থায় স্বয়ং ভীষ্মদেবও চঞ্চল হতেন, সাধারণ মানুষের কথা দূর ! আর কামুক মেঘের কথা না বলাই ভালো !

মেঘ নীলাম্বরখানা হরণ করে নিয়ে যেতে চায়, হরণটা কেন ? হরণ সম্ভোগের পূর্বকর্ম।...

*এ সকল ব্যাখ্যা পড়তে পড়তে আমি ক্রমশ এক অনাস্বাদিত জগতে। বই বন্ধ করে বললাম—*pervert *!*

—কে ? আমি ? না কালিদাস ?

—দুজনেই।

—ঠিক আছে, কিন্তু কেমন লাগল বল !

—অসাধারণ—নিজেকে সামলাতে সামলাতে বললাম আমি।

—তবে সমগ্র মেঘদূত তা বলে এমনতরো নয়, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ !

—কিঞ্চিতেই অস্থির !

সংস্কৃত ভাষাও কিছু চর্চা করেছে ও, মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলির প্রকৃত রস আস্বাদনের জন্য। যদিও বাইরে নানা ছ্যাবলামি করে কিন্তু ভেতরে ও গভীর সাগর। ওর ইচ্ছা দীর্ঘ কবিতায় একটা প্রেমের উপন্যাস লিখবে যার মধ্যে নিষিক্ত থাকবে আদিরস। আদিরস তো প্রেমের অন্য উৎস। তাকে বাদ দিয়ে কি জীবন ? হয়তবা কয়েক বছর ধরে লিখবে, সেটা হবে কালজয়ী। কিংবা হয়ত কিছুই হবে না...

কিন্তু কিছু আয় করা ওর খুব দরকার। কিন্তু কি চাকরি ও করবে ! কেইবা ওকে চাকরি দেবে ! পাড়ায় একটা বড় লাইব্রেরী আছে ওখানে ও free Service দেয়। পাঠাগারের প্রাচীন গ্রন্থসম্ভার যেন ওরই সম্পদ। বই কেনার ব্যাপারে ওর পছন্দকে কিছু গুরুত্ব দেয় সমিতি। এসব নিয়েই আছে।

মাঝে মাঝে শান্তনু নিমন্ত্রণ করে, একসঙ্গে পানভোজন, ছ্যাবলামী—এভাবেই চলছে।

তরলে স্বচ্ছল হবার মতো পকেটে রেস্ত কালুরও নেই আমারও নেই। কালু তো পুরো বেকার, আমি যাহোক একটা চাকর করি, কিন্তু মা বাবা ও এক বোন নিয়ে ভাড়া বাড়িতে থেকে ওই মাইনেতে সংসার চালানোই দায়।

শান্তনুও টি. ভি. সিরিয়ালের সহকারী পরিচালক। বিবাহিত। ওর বউ মৌমিতার অত গোঁড়ামি নেই, বলে—খাবেই জানি শুধু শুধু অশান্তি করে লাভ কি। Limit রেখে চলো। শান্তনু আমাদের মাঝে মাঝে ওর ফ্ল্যাটে ডাকে। আমরা প্রথাগতভাবে জিজ্ঞাসা করি—আজকে কি উপলক্ষ্য ?

মৌমিতা উত্তরটা দেয়—এই কদিন কাজ নেই বলে বাবুর গাটা ম্যাজম্যাজ করছে, তাই !—আবার কোনোদিন বলে—এই কদিন খেটে খেটে বাবুর গা গতরে ব্যথা হয়ে গেছে, তাই !

সেদিন মৌমিতা বলল—আজ কালুদার জন্মদিন।

—তাই নাকি ? যাঃ বাবা ! আমার জন্মদিন ? হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো ! শান্তনুও কালুকে খুব ভালোবাসে। ওরও ইচ্ছা কালু কবিতা লিখে নাম করুক।

ডাইনিং টেবিলে বসলাম আমরা, একটা কেক এনে রাখল মৌমিতা। একটা ছুরি আর একটা মোমবাতি—মোমবাতি জ্বালিয়ে কেকের ওপর গুঁজে দিলো। আমরা গান করলাম। কেক কেটে সকলকে দিলো কালু। Happy Birth Day to you.—

—এবার এখনই একটা কবিতা—অন্তত দুলাইন রচনা করে শোনা—শান্তনু বলল, —একেবারে আনকোরা।

সবাই চুপচাপ।

ছবিটা কালুর হাতে ধরা, ক্রিম লেগে আছে, সাবধানে ক্রিম মুছে নিয়ে জিভে ঠেকালো, বলল—

সারাক্ষণ আমি এক তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বহন করছি বুকের মধ্যে...

ছুরিটা বুকের ওপর স্পর্শ করল, বলল—

'একটু অসাবধানতায় ঘটে যায় রক্তপাত'...

—ছুরিটা সরান তো—ভীত ভাবে বলল মৌমিতা—রাখুন টেবিলে, জন্মদিনে এ কবিতা !

—এমন আনন্দের আড্ডায় দুঃখ ঢেলে দিলি ?—শান্তনু বলল।

—দুঃখ কোথায় ? এ কবিতায় আমি তো ভালোবাসার কথা বললাম।

—ওঃ ! তাই বলো ! —একটু ভেবে নিয়ে বলল মৌমিতা, স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল, ভেতরে চলে গেল। শান্তনু টেবিল সাজাতে লাগল। মৌমিতা বলেই দিয়েছে—ওসব গেলাস টেলাস সাজাতে টাজাতে পারবে না, তবে খাবার দাবার বানিয়ে দিতে পারি, রান্নাঘর থেকে নিয়ে আসতে হবে।

তরল একটু ঘনীভূত হয়েছে।

—সারাক্ষণ আমি এক তীক্ষ্ণধার অস্ত্র...বুকের মধ্যে... শান্তনু মৃদু স্বরে বলল—বেশ ভাবনা, বেশ, কয়েকটা কবিতা আমাকে দিবি তো, একটা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদক আমার ছবির গল্পকার, ওকে দেবো।

—তুই ছবি করছিস ? কই বলিস নিতো ?

—আরে ধুর, ছবি করছি না, ওর একটা গল্প আমার দারুণ লেগেছে, নব্বই থেকে একশ মিনিটের একটা ভালো আর্ট ফিল্ম করা যায়, চিত্রনাট্য লিখছি। যদি কোনো প্রোডিউসার পাই।

একটু ধুম লেগেছে। তিনজনেই বেশ উত্তেজিত। কালুর কবিতা ছাপা হবে। শান্তনুর আর্ট ফিল্ম হবে, আর ওদের আনন্দই আমার আনন্দ।

শান্তনু উঠে গিয়ে রান্নাঘর থেকে চিকেন পকোড়া নিয়ে এল, বলল— রাতের খাবার এখানেই।

মৌমিতা বেশ গোছানো মেয়ে। কি একটা চাকরি করে। বিয়ের পর শান্তনুর এই অনিয়মিত রোজগারের সঙ্গে নিজের রোজগার জুড়ে এই ফ্ল্যাটটা কিনেছে। অবশ্য ব্যাঙ্কে কিছু ধার আছে। ফ্ল্যাট্‌টা সাজিয়েছেও বেশ।

—আমার একটা Objection *আছে—রান্নাঘর থেকে উঁচু গলায় বলল মৌমিতা। মৌমিতার কথায় আমরা সকলে গুরুত্ব দিই—*

—বল, বল, বল,—আমরা তিনজনেই বলে উঠলাম—কিছু অন্যায় হয়ে গেল নাকি?—চিন্তিত ভাবে বললাম আমি।

—না, না, আমার Objection *কালুদার নামটা নিয়ে, ওই নাম কবিকে মানায় না।*

—কিন্তু 'কালি', 'কালোসোনা',—এসবের ওপর ওর খুব দুর্বলতা যে—

—'কালোসোনা' মানে তো কৃষ্ণ, তাহলে 'কালিকৃষ্ণ' হোক মৌমিতা।

—কি রে কালু, চলবে ? —শান্তনু।

—এ যে একেবারে শিশু শিশু থেকে বুড়ো বুড়ো হয়ে গেল। —আমি।

—ধুর, আমার কবিতা ছাপার দরকার নেই। বারো বছর হয়ে গেল কবিতা লিখছি, এখনও ছাপার অক্ষরে নামটা দেখলাম না। ওসব হবে টবে না।

—সে কি রে ? এটুকু খেয়েই একেবারে উদাস হয়ে গেলি ? Maturity *বলে একটা কথা আছে তো !' এতদিনে* Maturity *এসেছে, পুরোনো সব লেখা ঘসা মাজা কর, দেখবি ঠিক জায়গা পাবি।*

—ঠিক ঠিক, বললাম আমি—তোরও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে, ছবি করলে ভালোই করবি, বলা যায় না জাতীয় পুরস্কার বা বিদেশ থেকে পুরস্কার পেয়ে যাবি।

—আমার কথা ছাড়, ওসব লাখ লাখ টাকার ব্যাপার, অত সোজা নয়, কিন্তু লাখ কথার এক কথা হচ্ছে ছাপার অক্ষরে নাম, ওই নাম বাবা পাল্টাও, কি মৌ, আর কিছু ভাবো !

—'কালিন্দি' চলবে ?

—বড্ড মেয়েলী হয়ে গেল না ? কালিন্দি মানে কি ?

—'কালিন্দি' হচ্ছে যমুনা নদীর নাম।

—তাহলে তো মেয়ে নামই হয়ে গেল।

—হোক না, কেউ ভাববে মহিলা কবি, কেউ ভাববে পুরুষ, বেশ রহস্যময় হয়ে রইল।

—নাঃ !—ঠক্ করে গেলাস নামিয়ে বলল কালু।

—তাহলে ওটা কৃষ্ণেন্দু করে দাও, কৃষ্ণেন্দু বসু।

একটু চুপচাপ, তারপর—এটা চলতে পারে—বলল কালু।

—Done—*বললাম আমি।*

—Cheers, Cheers, Cheers, three Cheers for *কৃষ্ণেন্দু—পকোড়ার প্লেট খালি হয়ে গেল। বেশ ভালো লাগছে।*

—রবীন্দ্র সেতুর ওপর বাড়ি করার ব্যাপরটা তো বাতিল হলো,—শান্তনু পুরনো কথা উস্কে দেয়—আমি একটা তৈরী বাড়ি দেখেছি—

—কোথায় ?

—গড়ের মাঠের ওই উত্তরে, ওইসব হালফ্যাসানের উঁচু উঁচু বাড়ি নয়, মোটে দোতলা ! পুরোনো ডিজাইন। খুব একটা বড়ো নয়, তবে বাগানটা বিরাট। বাড়িটার মাথায় একটা গম্বুজ আছে, তার ওপর একটা পরী বাঁশি হাতে দাঁড়িয়ে। মৌ আমি সেদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম, সাদা ধবধবে শ্বেত পাথরের বাড়ি, আমি কিনব ভাবছিলাম, তা মৌ বলল কালুদার জন্য থাকা, কবি মানুষ।

—পাহাড়ের ওপর তো ?

—না, পাহাড় নেই।

—তাহলে হবে না।

—তাহলে তুই মনুমেন্টটাই কিনে ফেল, একটু আধটু মেঘ নিশ্চয় মনুমেন্টের মাথা ছুঁয়ে যায় !—

—কোথায় পাহাড় আর কোথায় মনুমেন্ট ! কি যে বলিস ! তাছাড়া ওখানে সব সময় থই থই করছে চাউমিন, রোল, ডাল, ভাত, তরকারি, আলুরদম, ঘুগনি—এসবের গন্ধের সঙ্গে বাসগুলোর ডিজেলের ধোঁয়া, তারসঙ্গে Urine-এর গন্ধ Punch হয়ে এমন একটা বিভৎস গন্ধ ভক্ ভক্ করে উঠছে উর্দ্ধপানে, এ্যাঃ ! —খাবার রেডি—মৌ চেঁচিয়ে বলল—এবার Stop

শান্তনুকে সাধারণত ফোন করা হয় না। কিবা বলার আছে ! ও ওর মেগাসিরিয়াল নিযে ব্যস্ত। Off day তে বৌকে নিয়ে বেরোয়-টেরোয়, সুতরাং ওর ফোনের অপেক্ষাতেই থাকি। এই অপেক্ষার মধ্যে একটু নেশার টান আছে বুঝতে পারি। সাধারণত শান্তনুর ফোন মানেই মদ্যপানের ডাক। এটা যখন বুঝতে পারি তখনই আমার মনের মধ্যে একটা ভয়—মনে হয় ক্রমশ আমি আসক্ত হয়ে পড়ছি। সামান্য মাইনের আমি একটা মানুষ যার ওপর নির্ভর করে রয়েছে বৃদ্ধ বাবা মা, অবিবাহিতা বোন। বিয়ে করার ইচ্ছা মনের মধ্যে প্রবল হলেও ছেঁটে ফেলতে হয়। কখনও এমন হবে না তো ? নিজের টাকায় মদ কিনতে না, এরকম হবে না—নিজেকে নিজেই সান্ত্বনা দিই। একটু চনমনে ভাব, একটু উত্তেজনা এছাড়া আর কি বা পাওয়া যায় পান করলে, তাহলে ? —এভাবেই মনকে বোঝাই। শান্তনুকে রাশ টানবার জন্য ওর বউ আছে, কিন্তু আমার ও কালুর জন্য ? কালুকে জিজ্ঞাসা করতে হবে—শান্তনুর ডাক পাওয়ার জন্য ওরও মন আনচান করে কিনা। তবু শান্তনুর ফোনের অপেক্ষাতেই থাকি।

শান্তনুকে নিয়ে আমার একটু গর্ব আছে। আমি একটা অতি সাধারণ চাকুরিজীবী মানুষ, যার বলার মতো কিছু নেই, যে অন্তত একে ওকে বলতে পারে—ওই হিট্ মেগাসিরিয়ালের সহ পরিচালক শান্তনু রায় আমার বন্ধু। হ্যাঁ, একসঙ্গে আড্ডা মারি। আরে সহ পরিচালকেই তো সব করে, পরিচালক শুধু এক নজর দেখে নেয়। কেউ হয়ত সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে—স্টুডিওয় গেছেন ? শুটিং দেখেছেন ? —হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাঝে মাঝেই যাই তো ! যদিও মাত্র একবার গিয়েছিলাম।

কালুও যখন খুব নাম করা কবি হবে তখন ওকে নিয়েও গর্ব করব—কবি—কি যেন নাম ঠিক হলো—কৃষ্ণ না কৃষ্ণেন্দু বসু—ও তো আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমাকে না শুনিয়ে কবিতা ছাপতেই দেয় না !

শান্তনুর ফোন এলো মাস দেড়েক পর। বলল—ওঃ একদম সময় হয় না রে, কতদিন মন খুলে আড্ডা দেওয়া হয়নি। কাল সন্ধ্যেবেলা চলে আয়, একটা উপলক্ষ্য আছে। রাত্রে খাওয়ারও নেমন্তন্ন, কালুকে বলে দিস।

ঘণ্টা বাজাতে দরজা খুলল মৌ !

—আসুন আসুন, আজ কালুদার জন্মদিন, Welcome জানাবো বলে কখন থেকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। Happy birthday to you কালুদা—

—এই তো মাস দেড়েক আগে কালুর জন্মদিন গেল—ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আমি বললাম—এর মধ্যেই আবার ? —ইয়ার্কি হচ্ছে ?

শান্তনু বসেছিল সোফায়, বলল—আয় আয়, বোস, ইয়ার্কি নয়রে, সত্যিই আজ ওর জন্মদিন।

মৌ ভিতরে চলে গিয়েছিল, একটা ফুলের তোড়া আর একটা প্যাকেট নিয়ে এসে কালুর হাতে দিলো, বলল—জন্মদিনের উপহার। ব্যস্তভাবে আবার ভিতরে গিয়ে এক প্লেট সন্দেশ নিয়ে এলো, বলল—মিষ্টি মুখ করুন।

—কি হেঁয়ালি হচ্ছে বুঝতে পারছি না—সন্দেশ তুলে নিতে নিতে বললাম আমি। কালুও হাঁ হয়ে গেছে। সন্দেশ মুখে পুরে মুখ বন্ধ করল।

—আরে বোস না—শান্তনু বলল।

দুজনে বসলাম। মৌও বসল শান্তনুর পাশে।

—প্যাকেটটা খোল্।

প্যাকেট খুলল কালু, বেরোলো দুটি পত্রিকা। কালুর হাত থেকে একটা বই হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখলাম, প্রায় শ'দুয়েক পাতার বেশ ভালোই পত্রিকাটি, নাম—'আত্মবিম্ব'—বেশ নাম ! মলাট উল্টে, কয়েক পাতা বিজ্ঞাপন পেরিয়ে, সূচিপত্র পেরিয়ে সম্পাদকীয় পেরিয়ে প্রথম লেখা—

কৃষ্ণেন্দু বসুর গুচ্ছ কবিতা—প্রেম। মুখ ফিরিয়ে পাশে তাকালাম—পত্রিকার পাতা খুলে কালু 'কৃষ্ণেন্দু বসু' হয়ে গেছে।

সত্যিই আজ ওর জন্মদিন।

—সম্পাদক বলছিলেন লেখা ভালোই, তাই যদিও আমি একটা কবিতা বেছে নিতে দিয়েছিলাম উনি পাঁচটি ছেপে দিয়েছেন।

কেমন স্নিগ্ধতায় ভরে গেছে কৃষ্ণেন্দুর মুখ!

—মৌমিতার তরফে তোকে একটা Gift দেবার আছে—শান্তনু বলল—বলতে সঙ্কোচ বোধ করছে ও, যদি তুই কিছু মনে করিস। একটা চাকরি—ওর অফিসের সূত্রে একটা যোগাযোগ হয়েছে।

—চাকরি ? —অবাক কালু—আমিও।

শান্তনু—চাকরিটা Secutiry-র।

কালু—মানে দারোয়ান ?

শান্তনু—এই, তুই কি অপমানিত বোধ করছিস ? সবটা শোন। জুবিলি সিটি, পঁচিশ তলা অনেকগুলি বাড়ির সমাবেশ, তার ওপর দিয়ে জুড়ে জুড়ে Sky walk—অর্থাৎ

সুসজ্জিত আকাশ উদ্যান। সেই উদ্যানের কোটাল—ব্যাপারটা ভাব একবার। লতানে ফুলগাছে ঢাকা একটা বসার জায়গা, মাঝে মাঝে ঘুরে দেখা।

—উদ্যান কোটালের পোষাকটা আমি design *করছি, ফুলে ফুলে ভরা শার্টের সঙ্গে সাদা প্যান্ট। মৌমিতা মৃদু স্বরে বলল, পাহাড়ের ওপর ফুলে ফুলে ছাওয়া, ছায়া ছায়া উদ্যান... ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বুকের মধ্যে জমে উঠবে কাব্য... লতা বিতানে ফিরে লিখে ফেলা... মেঘগুলি হয়তবা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে বরষার দিনে...হয়ত বা দেখা হয়ে যাবে কোনো চকিত হরিণী প্রেক্ষণার সঙ্গে...*